দিশারী

জুন, ২০২০

সম্পাদনা

ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

৮/২, বিজয়গড়, যাদবপুর

কলকাতা - ৭০০ ০৩২

পত্রিকা উপসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা	ঃ	ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী
সম্পাদক	ঃ	ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ	ঃ	ড. শম্পা দেবনাথ, ড. অভিজিৎ দাস, ড. গার্গী সাহা কেশ ড. মৃণাল বীরবংশী, অধ্যাপিকা পলাশ প্রিয়া হালদার, অধ্যাপক সুনন্দিত চৌধুরী, অধ্যাপিকা সোমা মজুমদার, অধ্যাপক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা বকুল শ্রীমানী।

প্রকাশ কাল	ঃ	জুন, ২০২০
প্রকাশনা	ঃ	**বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ** ৮/২, বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
অলংকরণ	ঃ	**হোয়াইট ফেদার এ্যাকাদেমী** ৪৫, দেবী নিবাস, দমদম, কোলকাতা
মুদ্রণ	ঃ	**স্কলার'স বুক হাব** ৪৫, দেবী নিবাস, দমদম, কোলকাতা - ৭০০ ০৭৪ যোগাযোগ ঃ ৯২৩১৯২৩২৯২, ৭০০৩৩১৪৪৬২

সম্পাদকের কলমে .....

অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা দিশারী পত্রিকার আরো একটি সংখ্যা প্রকাশ করলাম। করোনা অতিমারীর কারণে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ পায়ে পায়ে ব্যাহত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীদের মিলিত প্রচেষ্টা দিশারীর এই সংখ্যাটি প্রকাশনার পেছনে প্রধান প্রেরণা। বিভিন্ন ইতিবাচক ঘটনা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। 'দিশারী' ছাত্রছাত্রীদের দিশাহীন পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে এগিয়ে চলার পথ নির্দেশ দেবে বলে আশা রাখি। 'দিশারী' হয়ে উঠবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ করার আধার। 'দিশারী' বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁথিগত বিদ্যা ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার মেলবন্ধন ঘটাবে। পত্রিকাটি প্রকাশ করার জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত ছিলেন, তাদের প্রত্যেককে সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। বিগত বছরগুলির মতো এই সংখ্যাটিও ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দের সৃজনশীলতার সাক্ষ্য বহন করবে। প্রত্যেকের নীরোগ জীবন এবং সাফল্য কামনা করে আমাদের এই পত্রিকাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি, আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের ভালো লাগবে। আর ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলি, তোমরা যারা এখানে লিখলে বা যাদের আঁকা ছবি এই পত্রিকায় স্থান পেল তাদের মধ্যে কয়েকজনও যদি আগামীদিনের সাহিত্যিক, সাংবাদিক অথবা শিল্পী হয়ে উঠতে পারো, তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে। করোনা অতিমারীর সম্পর্কে সকলে সতর্ক থাকুন। সচেতনতাই প্রতিকারের প্রধান উপায়। সকলে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, সুস্থ থাকুন।

ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
দিশারী

Ishwar Chandra Vidyasagar

Ranjana Kundu
Student

Ishwar Chandra Vidyasagar was born in Bengali Hindu Brahmin family to Thakurdas Bandyopadhyay and Bhagvati Devi at Birsingha village in Hooghly district. Later, the village was added to Midnapore. At the age of 9, he went to Calcutta and started living in Bhagabat Charan's house in Burrabazar. Bhagbati's youngest daughter Raimoni's motherly and affectionate feeling towards touched him deeply.

His quest for knowledge was no intense that he used to study under a street light as it was not possible for him to afford a gas lamp at home. He cleared all the examinations with excellence and in quick succession. He was rewarded with a number of scholarship for his academic performance. In the year 1839, he successfully cleared his law examination. In 1841, at age of twenty one years Ishwar Chandra joined Fort William College as head of Sanskrit department.

After five years in 1846, Vidyasagar left Fort William College and joined Fort William College and joined the Sanskrit College as "Assistant Secretary'. In the first year of service he recommended a number of changes to the existing education system.

In 1849, he resigned from Sanskrit College and rejoined Fort William College as a head clerk.

Vidyasagar was liberal in his outlook, even though he was born in an orthodox Hindu Brahmin family. Also, he was highly educated and influenced by Oriental thoughts and ideas. Ramkrishna in contrast did not have a formal education. Yet they had a nice relation between them. When Ramkrishna met Vidyasagar he praised Vidyasagar as the Ocean of Wisdom. Vidyasagar joked that Ramkrishna should have collected some amount of safety water of that sea. But, Ramkrishna with profound humbleness and respect, replied that the water of general sea might be safety, but not the water of the sea of wisdom.

Between 2003 and 2005, he composed songs for several notable films Anbe Sivam, Madhurey. The year 2005 saw Vidyasagar receiving his first National Film Awards for his music hi the Telegu Film. The same year he composed music for film Chandramukhi, the only Rajinkanth starrer he has composed for till date. The songs become chartbuster, and so was the background score.

Ishwar - The Ocean of Knowledge

Sriparna Ray
Student

Iswar Chandra Bandapadhyay was Bengali Polymath who played a key role in Bengali Renaissance. There will be a short of adjectives to talk about this great personality. He was a man of multiple skills. Most note-worthy, he was an academic educator, philosopher, printer, enterpreneur, social reformer, philantropist, translator and also publisher. Ishwar Chandra is given the title of Vidyasagar because of his never-ending knowledge and wisdom.

Ishwar Chandra Vidyasagar was born on 26th September, 1820 at Birshingha village. Furthermore, his family was an orthodox Brahmin family. At age of 6, his parents sent him to Calcutta so as to live with Bhagabat Charan's house and began studying in a local school.

Vidyasagar passed in Sanskrit Grammar in 1841. He joined a Sanskrit College to teach as a part-time job. He also got knowledge of Vedanta and Astronomy. He also joined Fort William College as a Professor to teach the Sanskrit language.

Ishwar Chandra Vidyasagar made a lot of focus on women's status in society. He certainly tried to bring reforms to the status of women in those days. Vidyasagar faught and stood for the helpness of hindu widows. This is because the condition of Hindu widows in those days was quite depressing and miserable.

Ishwar Chandra Vidyasagar certainly received many accolades includes the Vidyasagar Setu which is most commonly known as the Second Hooghly Bridge. The bridge over the Hooghly River is named after the great personality. Secondly, Vidyasagar Mela which refers to a fair named after Ishwar Chandra Vidyasagar. The dedication of this fair is towards spreading education and social awareness. The fair has been successfully taking place on an annual basis in West Bengal since 1994.

Then comes the Vidyasagar College / University. It is an esteemed College and there is also the University under the name of Vidyasagar. Both the College and University is situated in Paschim Midnapore. There is also Vidyasagar Street in Central Kolkata.

There is a famous statue of Vidyasagar at Barasat, the district center of North 24 Parganas. Besides this there is a Vidyasagar station whose location is at Jamtara district of Jharkhand. Also there is a Vidyasagar Hall of Residence at the Indian Institute of Technology, Kharagpur.

Vidyasagar was a man of immense rectitude and courage. Furthermore, he was a man who ahead of his time. This Government, in recognition of his phenomenal scholarship and cultural work, designated him with companion of the Indian Empire in 1877.

Ishwar Chandra Vidyasagar was a great personality. He is recognised as one of the country's gem. He not only uplifted the country's name with his knowledge but also helped women with his social reforms. Vidyasagar introduced practiced of widow remarriage and worked against polygamy. He was an multi-talented man of wisdom.

পরিবেশ দূষণ

সুস্মিতা দাস
ছাত্রী

এই নদী, এই মাটি বড় প্রিয় ছিল
এই মেঘ, এই রৌদ্র, এই বাতাসের উপভোগ
আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, কে কোথায় আছি?

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা ঃ

একুশ শতকের পৃথিবী যে বিপদের সঙ্গে সহবাস করে প্রতিদিন সর্বনাশের প্রহর গুনছে তার নাম পরিবেশ দূষণ। বিজ্ঞানের আর্শীবাদে গতিশীল সভ্যতা দূষণের আক্রমণে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর হিমশীতলতাকে অনুভব করছে। প্রতিটি সচেতন মানুষের দুশ্চিন্তা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রশাসনের কর্মব্যস্ততার কেন্দ্রে রয়েছে এই দূষণ।

পরিবেশ কী?

যে পরিমন্ডলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীজগৎ বেঁচে থাকে ও বড়ো হয়ে ওঠে তাকেই পরিবেশ বলে। প্রাণীজগৎ এবং প্রকৃতিজগতের সমন্বয়ে এই পরিবেশ গঠিত হয়। চারপাশের গাছপালা, নদীনালা, অরণ্য, পাহাড়ি নদী কিম্বা মরু অঞ্চল মিলে তৈরি হয় মানুষের পরিবেশ। অধ্যাপক মি: সি পার্ফ বলেছেন - কোনো বিশেষ সময়ে ও বিশেষ স্থানে মানুষের চারপাশে ঘিরে থাকা সামগ্রিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

পরিবেশের দূষণ ঃ

পরিবেশ যখন নানা নেতিবাচক কারণে প্রভাবিত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাকেই পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণের ফলে পরিবেশের গুণাগুন মানের অবনমন ঘটে। প্রাকৃতিক দূষণের ক্ষেত্র অনুসারে পরিবেশ দূষণকে বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মৃত্তিকাদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা যায়।

দূষণের কারণ ঃ

কারখানায় ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি ক্রমাগত বায়ুকে দূষিত করে চলেছে। শিল্পজাত ও কৃষিজাত বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ, গৃহস্থালির আবর্জনা ইত্যাদি জলদূষণ ঘটাচ্ছে। বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক শিল্পের বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি মাটিতে মিশে গিয়ে মৃত্তিকাদূষণ ঘটাচ্ছে। যানবাহনের শব্দ, শব্দবাজির ব্যবহার লাউড স্পিকারের শব্দ ইত্যাদি শব্দদূষণের কারণ।

দূষণের ফলাফল ঃ

পরিবেশবিজ্ঞানী সেস্পল মানুষকে বলেছিলেন, 'ভূ-পৃষ্ঠের ফসল' এবং 'প্রকৃতির সন্তান'। স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের বিপর্যয় মানবজীবনকে দারুণভাবেই প্রভাবিত করে। এই দূষণের কারণেই দেখা যায় ফুসফুস, হৃদযন্ত্রের নানা অসুখ।

জল ও মৃত্তিকাদূষণ কলেরা, হেপাটাইটিস্, টাইফয়েড এরকম নানা অসুখকে নিশ্চিত করে শিল্পসভ্যতার অনিয়ন্ত্রিত উন্নতির ফলে বায়ুমন্ডলে। গ্রিনহাউস গ্যাস পরিমাণ বেড়েছে, যা কিনা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্ম দিয়েছে।

এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মেরু প্রদেশের বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্রে জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ শ্রেণির অরণ্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পরিবেশদূষণের অন্যতম ফলস্বরূপ পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন, তোসমানিয়ান টাইগার, কোয়াস্সা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, টেকোপো পাপ-এর মাছ।

প্রতিকারের পথ ঃ

পরিবেশদূষণ প্রতিরোধের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন দূষণের কারণগুলি খুঁজে নিয়ে সেগুলি রোধে সচেষ্ট হওয়া। যেমন, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার, দূষণ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতির ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ুদূষণ ঠেকানো যায়। জৈব সারের ব্যবহার মৃত্তিকাদূষণ থামাতে পারে। তবে দূষণ প্রতিরোধে সবথেকে কার্যকরী হতে পারে নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করা এবং সামাজিক বৃক্ষরোপন। নাগরিক করতে পারে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের সাহায্যে মানুষকে তারা পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারে।

উপসংহার ঃ

একুশ শতকের সভ্যতার কাছে চাঁদে পৌঁছে যাওয়া যতটা গুরুত্বের বিষয় তার থেকেও পৃথিবীকে রক্ষা করা অনেক বেশি প্রয়োজন। অনেকগুলো শীর্ষসম্মেলন পার করেও পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কেরা কোনো নিশ্চিত আশার বাণী শোনাতে পারেননি। শঙ্কার এই দিনগুলিই হয়তো সভ্যতার নিয়তি।

সবুজ গ্রহের একি দশাকরণে মানুষ তুমি ?

পুলক কুমার সরকার
ছাত্র

আকাশ, বাতাস, জল, উদ্ভিদ জগত, প্রাণীজগত সবকিছু নিয়ে আমাদের পরিবেশ। এগুলির কোনটিকে বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধি ও অবিরাম পরিশ্রম-এ তার চারপাশের পরিবেশকে আরও সুন্দর করে সাজিয়েছে। মানুষ বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা ঊষর মরুভূমিতেও সোনালি ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর স্বার্থান্বেষী মানুষের লোভে প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ নানানভাবে দূষিত হচ্ছে। এই দূষণের ফলে শুধু পরিবেশ দূষিত হয়েছে তাই নিয় মানুষের জীবনেও নেমে এসেছে নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধি।

বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব এসেছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করতে জমিতে নানা প্রকারের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে মাটি দূষিত হচ্ছে। সারাবছর জমিতে সেচব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বহু নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে যেমন নদীর নদীর জল দূষিত হচ্ছে, তেমনি মাটিও দূষিত হচ্ছে। রাসায়নিক সার দ্বারা প্রস্তুত কৃষিজাত সামগ্রী থেকে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

জলের আর এক নাম জীবন। জল ছাড়া কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না। অথচ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার সংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেই কলকারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত জল নদীর জলে মিশে নদীর জলকে দূষিত করছে। এছাড়া শহরের সমস্ত নর্মদার জলও নদীতে পড়ে জলকে দূষিত করছে। ফলে জলবাহিত রোগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবাহিত রোগে মানুষ আজ বড়ও বিপন্ন।

পরিবেশ দূষণ একটা গুরুতর সমস্যা। আজ মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিঘ্নিত। মানুষ সৃষ্ট সভ্যতা মানুষের হাতেই বিনাশ হবে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিজ্ঞান যত উন্নতি সাধন করবে।

জ্ঞানের সাগর বিদ্যাসাগর

পুলক কুমার সরকার
ছাত্র

মহান মহান জ্ঞানী মানুষেরা সমাজে যেমন নিজেদের প্রভাব রেখে গেছেন ঠিক এমনই এক ব্যক্তিত্বের নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি খুব বিনয়ী এবং জীবন দৃঢ়সংকল্প এবং উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি সমাজ সংস্কারক, লেখক, শিক্ষক ও উদ্যোক্তা ছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের জন্য অবিরাম কাজ করে গেছেন। ভারতে শিক্ষা ও নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়।

বাঙালি হয়ে একজনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুই বাংলাতেই তিনি সমানভাবে জনপ্রিয়, শিক্ষামূলক কাজগুলির জন্যই মূলত তিনি জনপ্রিয়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ, তিনি বাংলার প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটান। তিনি বাংলার শিক্ষা প্রচারের প্রচুর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই

থেমে থাকেননি বরং সেগুলি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নেন। তিনি আধুনিক সিলেবাস তৈরী করেন। শুধুমাত্র নতুন আঙ্গিকে শিক্ষার প্রেক্ষাপট তৈরীই নয় শিক্ষকদেরও উপযুক্ত করে তৈরী করেছিলেন। তিনি জানতেন যারা এই নতুন সিলেবাস পড়াবেন তারা নিজেরাও এরকম শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত নয়। তাই তাদেরকেও সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য একটি করে নর্মাল স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনার শেষে তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যাপারেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান অপরিসীম। তিনি জানতেন সমাজে আদর্শ শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হলে নারী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে বেথুন কলেজ নামকরণ হয়। তিনি নারীদের শিক্ষামুখী করার লক্ষ্যে একটি অর্থায়ন ব্যবস্থাও চালু করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় খুবই উচ্চবিচারের মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষিত হয়েছেন এবং অপরকেও শিক্ষিত করেছেন। সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। পড়াশোনার গুরুত্ব সবাইকে বোঝানোর জন্য এবং একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন।

নারী শিক্ষার পথিকৃত বিদ্যাসাগর

শুভাঙ্গী রায়
ছাত্রী

JMC, VJRC, Radio, এখনের পরিবেশনা। শিক্ষার পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর।

উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক গণ্যমান্য মহাপুরুষদের জন্ম হয়েছিল। সেই সকল মহাপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২৩ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ছিল ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের মা ভগবতী দেবী এক অসামান্য মহিলা ছিলেন। সেই সময়কার কু-সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে থেকেও তিনি ছিলেন আধুনিক চিন্তার অধিকারিণী।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না হওয়ায় অতি অল্প বয়সেই ঈশ্বরের বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদাসকে অর্থ উপার্জনের জন্য কোলকাতায় যেতে হয়। সেখানে এসে এক ব্যবসায়ীর খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত হন তিনি খুবই অল্প পয়সার বিনিময়। এরপর ধীরে ধীরে তিনি তাঁর কাজের প্রতি ন্যায়-নিষ্ঠা, সততার দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে বাবার সেই অসামান্য গুণ ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও পূর্ণ বিকাশ পায়। প্রচুর দারিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করলেও তাঁর মনোভাব ছিল একদম দৃঢ়।

ছাত্রাবস্থায় তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কতটা মেধাবী ছিলেন তার প্রমাণ হয়তো আমরা আমাদের স্কুলের পড়ার বইতেই পেয়েছি। ঈশ্বরচন্দ্রের একটি গল্পে। আশা করি, তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছ আমি কোন গল্পের কথা এখানে বলছি। আর যারা এখনো বোঝোনি, তাদেরকে আমি গল্পটা একটু ছোটো করেই বলছি চলো!

একবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বাবার সাথে কোলকাতা যাচ্ছিলেন। সেখানে পথের ধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর মাইলস্টোন পোঁতা ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, পথের ধারে শীলের মতো দেখতে ওই জিনিসটা কী? তখন তাঁর বাবা তাঁকে বোঝান যে এটিকে বলে ''মাইলস্টোন'' এবং এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, সেখান থেকে কোলকাতার দূরত্ব আর কতটা এবং এর মধ্যে শেখা ইংরাজি সংখ্যাগুলোই সেখানকার দূরত্ব নির্ণয় করছে। এরপর বিদ্যাসাগর

সেই মাইলস্টোনে লেখা ইংরাজি সংখ্যা গুণতে গুণতে পথ চলতে থাকেন আর অতি দ্রুত শিখে ফেলেন ইংরাজি গণনা।

ঈশ্বরচন্দ্র এরপর তাঁর বাবার সাথে কোলকাতা সংলগ্ন বড়বাজারে অবস্থিত ভাগবত সিংহের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন এবং শিবচরণ মল্লিকের তত্ত্বাবধানে তাঁরই পাঠশালায় একবছর পড়াশোনা করেন।

১৮২৯ সালের ১লা জুন তিনি কোলকাতার একটি সরকারি কলেজে ভর্তি হন এবং পরীক্ষায় দারুণ ফল করায় কলেজ থেকে প্রতি মাসে ৫০টাকা করে বৃত্তি পেতেন। এরপর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পড়েন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর ব্যাকরণ, বেদান্ত, স্মৃতি ন্যায়, জ্যোতিষ শাস্ত্র, কাব্য এবং অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দিনময়ী দেবীর সাথে। ১৮৪৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন হিন্দি ''বেতাল পচ্চিসী'' অবলম্বনে রচিত ''বেতাল পঞ্চবিংশতি'' গ্রন্থটিকে। এটিই ছিল তাঁর প্রথম গ্রন্থ উপন্যাস, তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় তার বেতন ছিল মাত্র ৫০ টাকা।

১৮৫০ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সাথে মিলে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যার নাম ছিল সর্ব্বশুভঙ্করী পত্রিকা। সেটার প্রথম সংখ্যায় ''বাল্য বিবাহের দোষ'' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করা হয়। তিনি নিজের জন্মভূমি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অবৈতনিক স্কুল। এছাড়া নারী শিক্ষার প্রসারও তিনি করেন, বিধবা বিবাহের মত সুন্দর একটি প্রথার প্রচলনও তিনি করেন সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতি ভেঙে। এর ফলে তাঁকে অনেক অপমান, বিদ্রুপও সহ্য করতে হয় সাধারণ মানুষদের থেকে।

ছোটদের শিক্ষার জন্য তিনি লিখে গেছিলেন বর্ণপরিচয়, কথামালা, ইশপের গল্পের মত কিছু অনবদ্য বই যা আজও বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বই হিসাবে পরিচিত।

শেষ জীবনে এসে তিনি কোলকাতার বাদুড়বাগানে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। ১৮৯৯ সালে ২৯শে জুলাই বাংলার নবজাগরণের এই পথিকৃৎ রাত্রি ২:১৮ মিনিটে তাঁর কোলকাতার বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনী আমাদের কাছে শুধু জীবনী নয়, এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ শিক্ষার সমান। তিনি আমাদের এটা শিখিয়েছেন যে, মানুষের উপকার কীভাবে করতে হয়, সমাজের বিপন্ন মানুষদের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে হয়, শিখিয়েছেন আসল মাতৃভক্তি ও এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন আমাদের সবাইকে যে, কীভাবে একজন চাইলেই যে কোনো স্থান-কাল-অবস্থায় কোনো কিছু শিখতে পারে, সে রাস্তায় রাস্তায় চলতেই হোক না কেন।

পরিবেশের অসুখ

শুভাঙ্গী রায়
ছাত্রী

JMC, VJRC, Radio, এখনের পরিবেশনা। পরিবেশের অসুখ

পৃথিবীতে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে, আধুনিকীকরণ হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবেশ। আর এই পরিবেশের ক্ষতিগ্রস্থতার ফলে জনজীবনে নেমে আসছে কালো ছায়া।

নগরায়ণের জন্য বনজঙ্গল সাফ করে বাসস্থান গড়ে তোলা হচ্ছে। অত্যাধিক হারে গাছ কেটে বড়ো বড়ো অট্টালিকা, আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে। এই গাছ কাটার ফলেই বৃষ্টির অভাব দেখা দিচ্ছে। খরা হচ্ছে, আবার যখন অত্যাধিক হারে বৃষ্টি হচ্ছে তখন বন্যা দেখা দিচ্ছে। কারণ গাছকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলার ফলে মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে, ফলে

বন্যার সময় নদীর পাড় ভেঙে যাচ্ছে। প্রচুর মানুষ বাসস্থান হারা হচ্ছে।

কলকারখানা তৈরি হচ্ছে শিল্পায়ণের জন্য। এই কারখানার দূষিত জল নদী, পুকুর, খাল-বিল-এ পড়ে জলকে দূষিত করছে। এই জন বাষ্পীভূত হচ্ছে এবং পরবর্তী কালে অ্যাসিড বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ছে। এর ফলে মাটিও দূষিত হচ্ছে। মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ছে। কৃষিকাজে বাধা আসছে। এই বৃষ্টি মানুষের ত্বকে নানারকম রোগের সৃষ্টি করছে।

যথেচ্ছভাবে জল অপচয়ের ফলে জলস্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। তাতে মিশছে আর্সেনিক। এই জন পান করার ফলে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। দূরারোগ্য রোগ দেখা দিচ্ছে।

ফ্রিজ, এ.সি., গাড়ির থেকে দূষিত ধোঁয়া থেকে ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন গ্যাস নিঃসারিত হচ্ছে। এই গ্যাস ওজন স্তরকে পাতলা করে দিচ্ছে এবং স্তরে গহ্বরের সৃষ্টি করছে। এর ফলে UV-রে পৃথিবীতে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারছে এবং মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। এই ক্ষতিকারক রশ্মি ত্বকের নানারকম ক্ষতি করে। সূর্য-রশ্মি পৃথিবীতে অত্যাধিক হারে প্রবেশ করার ফলে দিন দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋতু, জলবায়ুর সময়ের পরিবর্তন ঘটছে। সুমেরু-কুমেরুর বরফ গলে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই সুনামি দেখা দিতে পারে। ভূমিকম্পের পরিমাণও বাড়ছে। আর এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য একমাত্র দায়ী মানুষ।

মানুষ বিজ্ঞানের উন্নতি, আধুনিকীকরণ ঘটানোর জন্য যদি পরিবেশের উপর এইভাবে অত্যাচার চালাতে থাকে তাহলে পরিবেশও তার প্রতিশোধ তোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই দিন আর বেশী দূরে নেই।

পরিবেশের অসুখ

সুমন বেরা
ছাত্র

INTRO

''পরিবেশ বন্ধু''।

JINGLE

পরিবেশ বন্ধু অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমাদের অনুষ্ঠান আপনি শুনতে ভালোবাসেন মানে অবশ্যই আপনি পরিবেশ বান্ধব। আজকাল অধিকাংশ মানুষ সচেতন হয়ে পড়েছে। পরিবেশ দূষণ আজ সারা পৃথিবীর একটি বিরাট সমস্যা। হাজার হাজার মানুষ জর্জরিত এর জেরে। সব রকম দূষণ থেকে আমাদের একমাত্র রক্ষা করতে পারে উদ্ভিদ। এত সচেতনতা সত্ত্বেও আমরা সেই উদ্ভিদকেই বাঁচাতে পারছি না। যদি উদ্ভিদকেই আমরা বাঁচাতে না পারি তাহলে আমাদের বাঁচা হয়ে উঠবে দুর্বিসহ।

শ্রোতাবন্ধুদের অনুরোধ বাজারে যাওয়ার সময় একটি করে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে যাবেন। কারণ আপনার নেওয়া একটা পলিথিন ভবিষ্যতের পরিবেশকে আরও অবাসযোগ্য করে তুলছে। বর্জ্য পদার্থ হিসেবে এই পলিথিন সভ্যতার ভয়াবহ শত্রু। বিশ্বজুড়ে পরিবেশবিজ্ঞানীদের বারণ সত্ত্বেও এর ব্যবহার এর মাত্রা কিছুতেই কমছে না। পলিথিন এক অবিনাশী বর্জ্য। যেখানেই ফেলা হোক না কেন এর কোনো শেষ নেই। পোড়ালে এই পলিথিন থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তাও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করা পরিবেশ স্বার্থে প্রতিটি নাগরিক এর কর্তব্য। এখন সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে পলিথিন মুক্ত একটি ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে। সাধারণ মানুষকেও তাই নিজেদের স্বার্থে পলিথিন বর্জন করতে হবে। কি শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের বাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে বাজারে যেতে অসুবিধে নেই তো।

পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যা। পরিবেশ সচেতনতার অভাবেই রাজধানী দিল্লী দিন দিন বাস করার যোগ্য থাকছে না। কাজেই এই সমস্যা থেকে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য শুধুই সরকার এর পদক্ষেপে কাজ হবে না তার সাথে সাথে সাধারন মানুষকেও সচেতন হতে হবে। মানুষ এর মনে চেতনা জাগলে তবেই পরিবেশ বিপর্যয় এর থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি।

অনুষ্ঠানের শেষে এটাই বলা পরিবেশ বিপর্যয়ের মতো নিঃশব্দ শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে আমাদের এখনই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

এতক্ষণ শুনছিলেন পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান ''পরিবেশ বন্ধু''। পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যে হবে।

দূষণে শেষ পরিবেশ

শেতাদ্রী ভান্ডারী
ছাত্রী

গঙ্গার জল নাকি শুদ্ধ অথচ গঙ্গাই নাকি আজ ড্রেনে পরিণত হচ্ছে। গঙ্গাকে দূষিত করার পেছনে আমরাই দোষী। নানারূপ আবর্জনা, কলকারখানা বর্জ্যবস্তু এগুলো ফেলার জন্য পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। সুস্থ পরিবেশ যেখানে - সুস্থ জীবন যেখানে। এই পরিবেশের প্রভাব মানুষের দেহ মনকে গড়ে তোলে। আমরা সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণকেই পরিবেশের দূষণকেই পরিবেশ দূষণ বলি। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হলে তা সহজেই স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটায়। এমন কী তা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। আজকাল উচ্চফলনের জন্য কৃষিক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে খাদ্যশস্য, তরি-তরকারি থেকে আরম্ভ করে পানীয় জল, শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠছে। মানুষ নিত্যনতুন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। অজীর্ণ, আমাশা, কলেরা প্রভৃতি জলদূষণের ফল। ক্রমাগত প্রচন্ড শব্দ পরিবেশকে দূষিত করে। ফলে আমাদের দেশে বধিরের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা দূষিত হলেই প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়। বিশুদ্ধ জল আমাদের জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত ধুলো, ধোঁয়া, গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি করে অবিরত বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হলে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ ও বনের সংরক্ষণ করতে হবে। জল যাতে দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রভৃতির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে।

আমাদের প্রাণ, আমাদের হাতে

সিমলিন দাস
ছাত্রী

পৃথিবীটা হারিয়ে যাবে পাঁচশো বছর পরে, হারিয়ে যাবে অনেক প্রাণী তোমার অত্যাচারে। গলছে বরফ মেরুদেশে বাড়ছে সাগর জল, প্লাবন হবে, তলিয়ে যাবে বহুদেশের স্থল। দূষণ ভরা বাতাস এমন হচ্ছে ফুটো আকাশ, ঝরছে যেথায় বিষ-রশ্মি আসছে ধেয়ে ত্রাস। গাছপালা সব ধ্বংস হবে, বাড়বে মরুভূমি, সবুজ গ্রহের একি দশা করলে মানুষ তুমি?

পরিবেশ কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব বা বিকাশের উপর ক্রিয়াশীল। সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, যেমন চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু প্রভাববিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান। বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এ অবনতি হয়েছে আরো দ্রুত। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দিকে পৌঁছতে যাচ্ছে। দুদশক আগেই প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হয়েছিল সিকিমে। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় এখনও চলছে পুরোপুরি প্লাস্টিক ব্যবহার। এমনিতেই প্লাস্টিক ব্যবহার ক্ষতিকারক, তার উপর পাহাড়ি জায়গায় ক্ষণভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের নিরিখে প্লাস্টিকের ব্যবহার আরো বিপজ্জনক।

এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বারোটি পাহাড়ি রাজ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে উদ্যোগী হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাগুলি যে পর্যটকের নিত্য যাতায়াতে প্লাস্টিকে দূষিত হচ্ছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বেড়াতে গিয়ে প্লাস্টিক ছড়িয়ে এলাকা দূষিত না করার জন্য একটি ন্যূনতম নাগরিকবোধের প্রয়োজন হয়। সেটি পর্যটকদের কাছ থেকে কাম্য। দূষণের অভ্যাসটি থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। উদ্যোগ একতরফা হলে, তা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

মাউন্ট এভারেস্টের 'ট্রাফিক জ্যামের' কথা সবাই জানেন আশা রাখছি। যা থেকে হিমালয়ের বুকে জঞ্জাল জমা হওয়ার আন্দাজ করা সম্ভব। কিন্তু সব মিলিয়ে অভিযাত্রীদের ফেলে আসে বর্জ্যের পরিমাণ সাত হাজার কেজি, কেউ ভেবেছিল কি? নেপালের সেনাবাহিনী জানিয়েছে। এভারেস্ট থেকে চার হাজার কেজি জঞ্জাল কাঠমান্ডুতে নামিয়ে আনা হয়েছে। বাকি রয়েছে আরো তিন হাজার কেজি। এভারেস্ট থেকে জঞ্জাল সরানোর দায়িত্ব থাকে নেপাল সেনা, খুম্বু পাসাং লামু রুদ্ধাল মিউনিসিপ্যালিটি। এরপর অন্য পর্বতেও সাফাই অভিযান চালাবে নেপাল সেনা। এছাড়াও প্রবল সংকটে নৈনিতালের মূল আকর্ষণ নৈনি হ্রদ। চলতি গ্রীষ্মে মাত্রাতিরিক্ত হারে শুকিয়ে যাচ্ছে এই লেক। জলস্তর স্বাভাবিকের তুলনায় ১৮ ফিট নীচে নেমে গিয়েছে। বেড়াতে গিয়ে মনোরম নৈনি লেকের এই রকম হাল দেখে মুষড়ে পড়েছেন পর্যটকেরা। পরিবেশবিদদের মাথায় হাত। নৈনি হ্রদের দক্ষিণপ্রান্ত এলিতালে 'শূন্য' চিহ্নিত করা হয়েছে। এখান থেকেই হ্রদের গভীরতা ও জলস্তর মাপা হয়। সেন্টার ফর ইকোলোজি ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চের সিনিয়র রিসার্চ স্কলার বিশাল সিং বলছেন, 'বর্ষাকালে জলস্তর জিরো মার্কের থেকে ১২ ফিট উপরে উঠে যায়। এটাই এখানকার স্বাভাবিক জলস্তর। এমন জলস্তর স্বাভাবিকের থেকে ১৮ ফিট স্বাভাবিক জলস্তর। এমন জলস্তর স্বাভাবিকের থেকে ১৮ ফিট নিচে এসে গিয়েছে। নৈনি হ্রদের জলের মূল উৎস ছিল শহরের ৬০টি প্রাকৃতিক ঝরনা। তা এমন কমে দাঁড়িয়েছে ৩০টিতে তার জন্যেই এতটা নেমে গিয়েছে জলস্তর।

এই সব পরিবেশ দূষণের জন্য পরিবেশনীতিও তৈরী হয়। পরিবেশ নীতির লক্ষ্য হল পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাস্তুখানিক ভারসাম্য ও সতর্কতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা, পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতিকারক কর্মকান্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আর্ন্তজাতিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় কার্যকর সংযোগ রক্ষা। পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে নানান উন্নয়ন প্রকল্পে বিপন্ন হচ্ছে পৃথিবী। নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে সবুজ। বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে পুকুর, নয়ানজুলি, খাল-বিল। ভূগর্ভ থেকে ইচ্ছামত জল তোলা হচ্ছে। এইভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সেটা বুঝেই এবার উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিতে সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আমাদের পরিবেশ, আমাদের ভবিষ্যত

অর্ক ভট্টাচার্য
ছাত্র

শুনছেন জ্বপঞ্চ্ব)জ্বাট্রঞ্চ্ব ট্রথত্মদ্র এখন শুনবেন অনুষ্ঠান। **'আমাদের পরিবেশ, আমাদের ভবিষ্যত'** পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে।

পরিবেশ আজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। আমাদের সচেতনতা ও শিক্ষার অভাবে কখনো জেনে আবার কখনো না জেনেই পরিবেশের অবনমনে মেতে উঠেছি আমরা। একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নে চরম শিখায় পৌঁছলেও পরিবেশের অবনমন নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নই আমরা। পৃথিবী থেকে ১.৬ বিলিয়ন প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ আজ লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায়ের পথে। তার ভয়াবহকতার কথা ভেবে যুগ যুগ ধরে কিছু প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ এসেছে মানুষের কাছে। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের কাছে। পশ্চিমবঙ্গের দ্মত্রদ্রদ্মত্ত্বণ দ্বথন্ত্বতত্র ভুদ্র দ্বত্র ঠ ত্বদ্রদ্বদ্বঠ্ঠত্রত্র গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সারা রাজ্য জুড়ে পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত পরিবেশ সচেতনতা পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন।

আমাদের দেশের শতকরা ৪০ জন নিরক্ষর। বাকি চল্লিশ জনের মধ্যে ১৭/১৮ জনকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায়। অন্যরা কোন রকমে পড়তে পারে, লিখতে পারে, নাম দস্তখত করতে পারে। একটা স্বাধীন দেশের এতগুলো লোক নিরক্ষর থাকা জাতির পক্ষে ক্ষতিকর এবং লজ্জাকর। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও সভ্যতার যুগ। এ যুগেও আমাদের অধিকাংশ জনসাধারণ অশিক্ষিত বলে রক্ষণশীল, কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে আবদ্ধ। অজ্ঞতা আমাদের মনকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। তারা উন্নত চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। দেশের উন্নতি হওয়া তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই নিরক্ষরতাই আমাদের দেশের উন্নয়নের মূল বাধা। নিরক্ষতার কারণে জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সকল উদ্যোগে আমাদের পরাজয়ের অপেক্ষা। দারিদ্রতাই আমাদের নিরক্ষতার প্রথম ও প্রধান কারণ। আমাদের দেশের জনগণ এত দারিদ্র যে, দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় করাই তাদের পক্ষে কঠিন। এজন্য তাদের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার দু/এক ধাপ পৌঁছেই স্কুল থেকে বিদায় নেয়। তাছাড়া ব্রিটিশ এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকাররের শাসন ও শোষণ আমাদের অজ্ঞতার অন্যতম কারণ। ঔপনিবেশিক শাসন এদেশের মানুষকে অন্ধ রেখে তাদের ওপর শোষণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তিগত চেষ্টায় সেসময়ে দু/একজন সামান্য লেখাপড়া শিখতে পারলেও অধিকাংশ মানুষ পড়ে ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে। এখনো এ ধরণের মানসিকতা আমাদের মধ্যে কাজ করছে। এছাড়া কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির জন্য এদেশের মানুষ প্রতি খুব একটা আগ্রহী নয়।

বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষার। আমাদের দেশ বর্তমান সভ্য দুনিয়ার একেবারে শেষপ্রান্তে আছে। এর কারণ নিরক্ষরতা। আমাদের সমাজ জীবনে মামলা-মোকদ্দমা, জালিয়াতি-জুয়াচুরি, অন্যায়-অপরাধ ও নীতিহীন যত অপকর্ম তার মূলে রয়েছে এ নিরক্ষরতা। নিরক্ষতার অন্ধকার থেকে এদেশের মানুষকে আলোতে আনতে হবে। আমরা পরাধীনতার শিকল ছিড়ে স্বাধীনতা লাভ করেছি। এখন দেশকে

শিক্ষিত ও শক্তিশালীকরতে হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে এবং এই শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষার বদলে খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দেশে বিপুল সাড়া পড়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রসংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। এছাড়াও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে এবং তাদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাইমারি শিক্ষার জন্য যেমন সরকার দৃষ্টি দিয়েছে, সেরূপ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রাইমারি শিক্ষার জন্য ফল আস্তে আস্তে পাওয়া যায়, কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষার ফল সাথে সাথে পাওয়া যায়। স্বাধীন দেশের বয়স্ক নাগরিক অশিক্ষিত অবস্থায় থাকতে চায় না। বিদেশে এমনকি অন্ধ্র, বোবা ও বধিরদের রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষার সুযোগ দান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। জীবিকা অর্জন অথবা তার প্রয়াসের দরুণ বয়স্কদের পক্ষে লেখাপড়ায় বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য মাতৃভাষার সাহায্যে সামান্য উদ্যমেই কার্যকর জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব। এতে আমাদের বর্হিজগতের সাথে পরিচয়, সাধারণ জ্ঞান এবং ভাষা জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ সুযোগ দান করে। তাই বয়স্কদের শিক্ষাদানের উদ্যোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে বহু স্থানে স্থানীয় শিক্ষিত তরুণদের উৎসাহ উদ্দীপনায় গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের পরিচালকগণ আন্তরিক হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বেশি সময়ের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একটি নৈশ বিদ্যালয় হিসেবে চিহ্নিত করে অবসরকালীন কার্যক্রমের মাধ্যমে পালাক্রমে স্কুলত্যাগী, শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে। এতে স্কুল বা কলেজের একজন শিক্ষক সপ্তাহে একটি ক্লাসও ভাগে পাবেন কিনা সন্দেহ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানগণ ও শিক্ষকবৃন্দ প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রদের দায়িত্ব অপরিসীম। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যদি ছুটি দিনে নিরক্ষর মানুষের পাশে এসে অক্ষরজ্ঞান দান করে এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের আগ্রহী ও সচেতন করে তোলে, তাহলে সবচেয়ে বেশি সুফল পেতে পারে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ছত্ররা এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের শিক্ষিত লোক ও সমাজ কর্মীদের চেষ্টায় নিরক্ষরতা দূর হতে পারে। তারা যদি গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে পল্লির অশিক্ষিত নরনারীকে তাদের অজ্ঞতার পরিণাম, গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার ফলাফল সম্পর্কে ভালো করে বোঝান, তাহলে জনমনে সাড়া জাগবে।

মেয়ের মতো

তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়
ছাত্রী

''ছেলের মতো হতে হবে।''
কেন হবো ছেলের মতো?
মেয়ে বলে কি যায়না মানা!
সমস্যা মেয়ে হলেই শত!

দিনের বেলায় সবার দেওয়া
প্রশ্ন খোঁচা যত,
রাত বাড়লে একলা মনে
বাড়িয়ে তোলে ক্ষত -

সকাল হলেই যুদ্ধ শুরু
মেয়ে হয়ে বাঁচবার;
প্রশ্নগুলো আছে শুধু
উত্তর দরকার।

যুক্তিদেরকে গুছিয়ে রাখছি
প্রশ্ন রেখেছি তুলে,
উত্তর ঠিক কাজে দেবো
সঠিক সময় এলে।

আশা করি শুনবো তখন -
''মেয়েরা যেমন হয়,
তেমন করেই প্রাণ খুলে বাঁচ
ছেলের মতো নয়।''

কনকাঞ্জলি

তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়
ছাত্রী

কি করে তোমার ভালোবাসা মা
চালের কণায় মাপি বলো?
তোমার মতো ভালো করে
পারবো কি আর হাসতে ভালো?

আমার জন্যে সারাজীবন
পরিশ্রমে পরিশ্রমে
করলো যে শেষ নিজের আয়ু;
যাবো না ভুলে সেই বাবাকে!

আলতা পায়ে, লাল শাড়িতে,
লাল কুমকুম, শাঁখা হাতে;
আমায় যখন পর করে মা
সাজিয়ে দেবে নিজের হাতে!

বলো তখন কেমন করে
ভুলে যাব সমস্ত ঋণ?
তোমাদের ওই ভালোবাসা
ভুলে যাওয়া খুব যে কঠিন -

কনকাঞ্জলি ছিটিয়ে শুধু
মিটবে না কখনই দেনা;
চালের কণায় তাই তো মাগো
মাপতে মায়া মন চায় না -

ওইটুকু ঋণ থাক না আমার!
কনকাঞ্জলি থাকনা বাকি!
দেনা যখন ভালোবাসা
ও ঋণ আমি মাথায় রাখি -

বিনিসূতার মালাখানি

দেবাশিস দাস
ছাত্র

নদীর **ঢেউয়ে** শ্রাবন-ধারা
দেখতে চেয়ে আসলে না।
বৃষ্টি ফোঁটায় ভিজবে বলেও
কথা যে তুমি রাখলে না।
ছিলেম বসে নদীর কূলেই,
তুমি তো কৈ আসলে না।
বর্ষা-রাণী দেখতে চেয়েও
বৃষ্টি যে আর নামলো না।
মেঘলা দিনে মেঘের মালা,
ঐ ঝর্ণাধারায় ঝরলো না
মুক্তবেনীর এলোকেশও,
বৃষ্টি-ধারায় ভিজলো না।
আসবে বলে কথা দিয়েও
কেন তুমি আসলে না?
বাঁধনহীন ঢাকাই আঁচল,
বাদল হাওয়ায় উড়ল না।
কাজলটানা চোখের পাতায়,
ঐ সিক্ত-পলক পড়ল না।
চরণ নূপুর ঝুমুর ঝুমুর,
চলার তালে বাজলো না।
তোমার কানে ঝুমকো পাশা
হালকা বায়ে দুললো না।
মনিবন্ধের সোনার কাঁকন,
ঝনক ঝনক বাজলো না
ললাট পরেও তিলক খানি,
বারি-ধারায় মুছলো না।
আসবে বলে কথা দিয়েও,
কেন তুমি আসলে না?

তুলসী কাঠের কণ্ঠমালায়
বিন্দু বারি লাগলো না।
কমলকলি অধর যুগল,
মুক্তা-হাসি হাসলো না।
যমুনার এই কৃষ্ণ জলেও
জলছবি তো আঁকলো না।
তোমার পথ চেয়ে চেয়ে
বাঁশিও আমার বাজলো না।
দূর গগনের পুঞ্জ মেঘ,
দূর দেশে যে ভাসলো না
তুমি হেথা নাইকো বলেই,
ঐ বর্ষণে মেঘ ঝড়লো না
আসবে বলে কথা দিয়েও,
কেন তুমি আসলে না?
কল্পনাতেই আঁকবো ছবি,
অভিসারে প্রেম জাগলো না।
ঢেউয়ের পরে বৃষ্টি নাচন,
জলকেলিতেও মিশলো না।
দুঃখ যতই দেওনা প্রাণে,
হৃদয়ে দীপ জ্বললো না
বিনিসুতায় গাঁথবো মালা
স্মৃতি-পাতায় ভুলবো না।
সজল চোখের অশ্রু-বারি
পথ তো পিছল করল না।
বেদন-আঁখির অঝোর ধারায়,
বরিষণ কেন দেখলে না?
তুমি ফিরে আসবে বলেও
আর তো ফিরে আসলে না।

ভালবাসা

সৌভিক দে
ছাত্র

মা .... মা .... ওমা, মেয়ের ডাকে তিস্তা ধড়ফর করে বিছানা ছেড়ে উঠে। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সোজা রান্নাঘরে যায়, তিতলির টিফিন বানানোর জন্য। তিতলি একটি বাংলা মাধ্যম স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। মেয়ের টিফিন তৈরি করার ফাঁকে তিস্তা দৌড়ে বারান্দায় যায়, সেখানে তার পোষা কিছু বদ্রি ও ফিঞ্চ পাখি আছে। মেয়ের হাঁকডাকের ফাঁকে সে ওদেরকে দানা ও জল দেয় আর ওদের সঙ্গে নানারকম কথা বলতে থাকে। বদ্রি পাখিগুলোর মধ্যে অসম্ভব ভালোবাসা। তিস্তা একটি গানের স্কুলে কাজ করে, সোমনাথবাবু কাজ করেন একটি বেসরকারি সংস্থায়। কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার আগে তিস্তা খাঁচাটাকে সামান্য কাপড় বা পাস্টিক দিয়ে ঢেকে যেত। বর্ষার সময় বৃষ্টি আসলে পাখিদের জন্য তার খুব চিন্তা হত। তার পরিবারের সঙ্গে পাখিগুলো যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ছুটির দিন সকালে উঠেই তার ভাবনা থাকতো কিভাবে ওদের ভালোভাবে রাখা যায়, তাই খড় দিয়ে নিজেই ওদের বাসা তৈরি করে দিত, হাতের চুড়ি দিয়ে দোলনা। সন্ধ্যা হলেই বদ্রি পাখিগুলোর মাঝখানে বসে নিরাপত্তা অনুভব করত। অদ্ভুত লাগত তিস্তার, ফিঞ্চ আর বদ্রির মধ্যে কোনো বিবাদ ছিল না, বরং ছোটো পাখি হলেও ফিঞ্চগুলোর খুব মেজাজ ছিল। ভালোই চলছিল সেদিন। যে কোনো জায়গা থেকে বাড়ি ফিরেই প্রথমে সে বারান্দায় গিয়ে দেখত পাখিগুলো ঠিক আছে কিনা, কিন্তু হঠাৎ একটি বাড়ি এসে বারান্দায় গিয়ে দেখল, খাঁচার ভেতরের একটা বদ্রি পাখি কাত হয়ে মরে পড়ে আছে, আর ওর ভালোবাসার পুরুষ পাখিটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, অন্যান্য পাখিগুলো যেন চুপ করে নীরবতা পালন করছে। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না তিস্তা, সকালবেলাতেই সে পাখি দুটোকে ভালোবাসার খেলা খেলতে দেখেছ। চিৎকার করে কাঁদতে গিয়েও কাঁদল না, ভাবল লোকে হাসবে। পাখিটার দুঃখকে কি করে দূর করবে, এটা নিয়ে সে সারারাত চিন্তা করল।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সোমনাথবাবুকে ঐ পাখির আর একটা জোড়া নিয়ে আসতে বলল। পরের দিন তিস্তার রবীন্দ্রসদনে গানের অনুষ্ঠান ছিল। সকলের প্রশংসা আর প্রচুর আনন্দ নিয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল সে, কিন্তু বারান্দায় দরজা খুলে সে চমকে উঠল, খাঁচার দরজা খোলা, জোড়া বদ্রি পাখি নেই, সাতটা ফিঞ্চ পাখির মধ্যে দুটো, আর প্রিয়জন হারা বদ্রি পাখিটি রয়েছে। বারান্দার আলো জ্বালিয়ে স্থির থাকতে পারল না, সে প্রবল কান্নার সঙ্গে বাড়ির দারোয়ান রামলাল, স্বামী, মেয়েকে ডাকতে আরম্ভ করল। খাঁচার অবস্থা দেখে সোমনাথবাবু আর তিতলি বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তিস্তার মনে হল এটা ভাম্ বিড়ালের কাজ। প্রচণ্ড রাগ হল, কিন্তু কিছু করার ছিল না। রামলালও মনের কষ্টকে চেপে খাঁচা পরিষ্কার করছিল, এ বাড়ির লোকেদের মতো তারও পাখিগুলোর উপর খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তিতলি লক্ষ্য করল, একটা ফিঞ্চ ভয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বারান্দায় বসে আছে, যেন বলতে চাইছে

আমায় তাড়াতাড়ি খাঁচায় ঢোকাও। চোখে জল চলে আসল তিস্তার, সোমনাথবাবু ধীরে ধীরে পাখিটাকে ধরে খাচায় ঢুকিয়ে দিলেন। তিস্তা, তিতলি, সোমনাথবাবু তিনজনেই মনের কষ্টকে চেপে ঠিক করলেন যে, পাখিগুলোকে ছেড়ে দেবেন বা পাখি বিক্রেতাদের দিয়ে দেবেন। বাড়ির চারপাশে প্রচুর নারকেল গাছ এবং অন্যান্য গাছও ছিল। পরের দিন সকালে সোমনাথবাবু জানলার সামনে খাঁচাটাকে বসিয়ে তার দরজা খুলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু পাখিগুলো কিছুতেই বের হতে চাইছিল না, ওরা যেন বলতে চাইছিল, 'আমরা তো খাচায় ভালোই আছি।' শেষ পর্যন্ত তারা উড়ে গেল। তিস্তা ভালোবাসার অনেক মানুষকে হারিয়েছে, কিন্তু পাখিগুলোকে হারিয়ে তিস্তার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বারবার আকাশের দিকে, গাছের দিকে তাকিয়ে ওদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। মনে হয়েছে প্রকৃতির সন্তান প্রকৃতির কোলেই মিলিয়ে গেছে। পাখিগুলোর জন্য মনটা তার ভীষণ খারাপ লাগছিল। রোজকার মতো সে কাজ থেকে ফেরার সময় বাড়ির গেটে ঢোকার আগেই ওপরে পাখির খাঁচার দিকে তাকাতো, অভ্যাস মতো আজও তাকালো। কিন্তু সেখানে খাঁচাটাকে দেখতে না পেয়ে চোখে জল এসে গেল। গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে, রামলাল বলল দিদি বদ্রি পাখিটা আপনার কাছে আবার ফিরে এসেছে। তিস্তা শুনে তো অবাক, পাখিটা সারাদিন আপনাদের বারান্দা আর সিঁড়িতে উড়ে বেড়াচ্ছিল, আমি ধরে ঝুড়ির মধ্যে চাপা দিয়ে রেখেছি জল আর চাল দিয়েছি। এই ঘটনাটা তিস্তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল - মানুষ মানুষের উপকার আর ভালোবাসা ভুলে যায়, কিন্তু এই পাখিটা ভালোবাসার টানে আবার তার কাছে ফিরে এসেছে। সে মনে করল এটা স্বপ্ন নয় তো, চিমটি দিয়ে দেখল যে, সে বাস্তবের মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল, ঠিক করল পাখিটাকে খাঁচার মধ্যে সবসময় রেখে দেবে। ভাবল ভালোবাসার সঙ্গীকে হারিয়ে যে এত দুঃখ পেয়েছে, তাকে আবার সে কষ্ট দিল, পাখিটাকে কাছে নিয়ে খুব আদর করতে ইচ্ছে করল। পাখিটার চোখে তখন কষ্ট, রাগ আর অভিমান সে দেখতে পেল। হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে সে খুঁজে পেল। ধীরে ধীরে সূর্যাস্ত হয়। তিস্তা এমনকি সোমনাথবাবুর কাছেও ঘটনাটা অদ্ভুত বলে মনে হয়। তারা পাখিটাকে খাঁচার ভেতরে জল আর খাবার দেয়। কিন্তু দেখা যায় স্বজনহারা পাখিটি খাবার থেকে শুরু করে একফোঁটা জল পর্যন্ত খাচ্ছে না, খাঁচার এক কোণায় চুপ করে বসে আছে। সকালে উঠেও সে দেখে যে খাঁচার এক জায়গায় পাথরের মতো বসে আছে। পাখিটার কষ্ট দেখে তিস্তা স্থির থাকতে পারল না। গাড়ি করে পাখির দোকানের সন্ধানে বের হল। যাদবপুরের একটি পাখির দোকানের সামনে গিয়ে লক্ষ্য করল বদ্রি পাখিটা অন্য পাখির আওয়াজ পেয়ে খাঁচার মধ্যে এদিক ওদিক করছে। দোকানটায় ঢুকে তিস্তা বলল, টাকা চাই না, ও যাতে ভালো থাকে তার জন্য অন্য পাখিদের মধ্যে রেখে দিন, কথাগুলো বলতে গিয়ে কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। গাড়িতে ওঠার আগে বারবার ঘুরে সে পাখিটাকে দেখছিল। পাখিটা তখন আপনজনদের কাছে পেয়ে তিস্তার দিকে আর ফিরে তাকালো না। চোখের জল সম্বরণ করে গাড়িতে সে উঠে গেল।

প্রবন্ধের বিষয় ঃ বিবেকানন্দের ১২৫ বছর শিকাগো বক্তৃতামালা

অয়ন ভট্টাচার্য্য
ছাত্র

ভূমিকা ঃ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালার ১২৫ বছর পর আমরা তার ভাষণগুলি মনে রেখেছি। আমি মনে করি আগামী ১০০০ বছর পরও তার বানীগুলি মনে রাখব।

স্বামীজির কথা শুনে তাঁর বহু বন্ধু ও ভক্তরা পূর্ণ উদ্যমে তাঁর পাশ্চাত্যযাত্রার আয়োজন করতে শুরু করলেন। মাদ্রাসের যুবক-ভক্তরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। তা দিয়ে তারা স্বামীজির জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে দিলেন। যেটুকু টাকা বেচেছিল স্বামীজির সঙ্গে দিয়ে দিলেন। পরে খেতরির রাজা ঐ টিকিটটাকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট-এ পরিবর্তিত করে দেন এবং স্বামীজি তাঁর গুরু বলে, স্বামীজির জন্য একটি সিল্কের আলখাল্লা ও পাগরি তৈরি করিয়ে দেন।

প্রায় দু-মাস পরে, পথে একবার জাহাজ পাল্টে, ২৫ জুলাই ১৮৯৩ স্বামীজী 'এম্প্রস অফ ইন্ডিয়া' জাহাজে কানাডার ভ্যাঙ্কুবের বন্দরে উপস্থিত হলেন। ভ্যাঙ্কুবের থেকে দু-বার ট্রেন পাল্টে শিকাগোয় এসে উপস্থিত হলেন ৩০ জুলাই, রবিবার, রাত এগারোটায়।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার ধর্মসভা শুরু হলো। ঠিক দশটার সময় আর্ট ইনস্টিটিউটের কলম্বাস হল-এ সমবেত দশটি ধর্মের উদ্দেশ্যে দশটি ঘন্টাধ্বনি হল। এই দশটি ধর্ম হল - ইহুদী ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, তাও ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, শিন্টো ধর্ম, পারসিক ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম এবং গ্রীক চার্চ এবং প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম। সেই বিরাট হল, তার অদ্ভুত জাঁকজমক আর সামনে উপস্থিত কয়েক হাজার শ্রোতা - এসব দেখে স্বামীজীর মত মানুষও প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। সকালের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করলেন না।

দ্বিতীয় অধিবেশনে চারজনের বক্তৃতার পর স্বামীজী বক্তৃতা দিতে উঠলেন। দেবী সরস্বতীকে মনে মনে প্রণাম করে তিনি এগিয়ে গেলেন। যেই তিনি সম্বোধন করলেন - 'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা' - আমেরিকাবাসী আমার বোন ও ভায়েরা, সঙ্গে সঙ্গে সেই কয়েক হাজার নরনারী হর্ষধ্বনীতে ফেটে পড়ল। দু-মিনিট তাদের করতালী চলল। হাততালী থামলে স্বামীজী সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিলেন। যার মর্মার্থ হল শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'যত মত তত পথ' বাণী। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের জয়গান করলেন না স্বামীজী। সব ধর্ম যে সমান সত্য, ভারতবর্ষের মানুষের এই সনাতন বিশ্বাসকেই তিনি সকলের সামনে তুলে ধরলেন। সেই ভাষণে তিনি বললেন ঃ

হে আমেরিকাবাসী বোন ও ভায়েরা, আপনারা আমাদের আমাদের যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, তার উত্তরে কিছু বলতে উঠে আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবধর্মের যিনি জননী স্বরূপ, তাঁর নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নর নারীর পক্ষ থেকে।

১৫ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী কূপমন্ডুক বা কুয়োর ব্যাঙের গল্পটি বলে বুঝিয়ে দিলেন, কেন ধর্মে ধর্মে মতভেদ হয়। কুয়োর ব্যাঙ কুয়োতে চিরকাল রয়েছে, কুয়োর বাইরে কখনো যায়নি। তাই সাগর থেকে এক ব্যাঙ এসে যখন বলল, সাগর তার কুয়োর থেকে লক্ষগুণ বড়, তখন সে তাকে মিথ্যেবাদী বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। এই গল্পটি বলে স্বামীজী বললেন, 'আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ছোট কুয়োর মধ্যে বসে ভাবছি সেটাই সম্পূর্ণ জগৎ।

১৯ সেপ্টেম্বর স্বামীজী হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে লিখিত বক্তৃতাটি পাঠ করলেন। এটি ধর্মসভায় তাঁর প্রধান বক্তৃতা, কারণ ধর্মসভায় তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছিল হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে। হিন্দু ধর্মের সমগ্র কোন নির্দিষ্ট দেবদেবীর কথা তিনি বললেন না।

তাঁর 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, তিনি দেখালেন, নিজের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও কিভাবে মানুষ অন্য ধর্মকে মর্যাদা দিতে পারে, একটি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও মানুষ কিভাবে নিজেকে বিশ্বজনীন ধর্মের উন্মুক্ত আঙ্গিনায় প্রসারিত করে দিতে পারে।

২০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন ঃ ভারতে সবচেয়ে বেশী অভাব ধর্মের নয়। ভারতে ধর্ম যথেষ্ট আছে, ভারতে সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র ঃ- আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম। খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে অখ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য পাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, বেশ বুঝতে পেরেছি।

শ্রোতারা বুঝলেন, বিবেকানন্দ শুধু বাগ্মীই নন, হৃদয়বান দেশপ্রেমিক। তাঁর পঞ্চম বক্তৃতা ছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর। তিনি বললেন ঃ 'বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই পরিপূরক।'

২৭শে সেপ্টেম্বর, মহাসভার শেষ দিনে স্বামীজী আবার বাগ্মিতার শিখরে পৌঁছে গেলেন। বিদায় ভাষণে তিনি বললেন ঃ ''আমি সেই মহানুভব ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাই, যারা তাদের উদার হৃদয় ও সত্যানুরাগ দিয়ে প্রথমে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং পরে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। এই সভামঞ্চ থেকে যে সব উদার ভাব প্রবাহিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি আমার ধন্যবাদ।

Relevance of Women's Day in India

Srinjoyee Das
Student

"Whatever glory belongs to the race for a development unprecedented in history for the given length of time, a full share belongs to the womanhood of the race" – Mary MacLeod Bethune.

Woman – the power to create, nurture and transform ! The word 'woman' conjures up the images of selfeless love, care and affection. At the same time women ignite the spirit of power and hope. Unfortunately, across the world, women had to fight for their independence and protection of rights. Since decades, women had struggled and are still fighting to express their right to speech, to vote, to equality, to education, to income and most importantly to freedom. The objective of Women's Day is to express love and gratitude towards women's contribution to our lives and society. It honours the power and struggles of women who have broken all barriers and reached the pinnacle of success in every sphere of life. Today, women across the globe actively participate in politics, education, social work, corporate sports, IT, research and development, innovation and diverse fields and have lift their footprints. It is incredible and unbelieval that woman plays various roles and that too with love and full enthusiasm – "Woman", she is mother, a sister, a wife, a daughter and the most dedicated employee at her work place. She indeed the pillar of the society on whose shoulder there is onus to take forward the existence of manking in a smoother way. She is generous, passionate and audicious and she knows an absolute solution to all the problems. Women's Day in India is celebrated on the 8th March. Though the celebration of the concept of International Women's Day came from the western countries, the Indians highly appreciate this and also observe this day to express their love and respect to women. When it comes to India awareness of International Women's Day is much more only in metro cities. However in recent years even people in small towns are coming to know about the Women's Day celebration and send cards and flowers to one lady they look upon.

In India it is also celebrated by arranging for official meetings with most successful woman and then having lunch or dinner. Throughout India, there is an increase in shapping activity where the focus of men revolves around purchasing the best gifts for the women in their lives. In India, Women's Day is about ensuring that the society is just and fair to all its members including women like many other countries women's day in India is celebrated with the similar enthusiasm. Many organizations public and private gear up to participate in various activities like mass rallies, seminars, documentories and TV shows. NGO's workings towards uplifiting women organise gender sensitive plays. In India several organizations are working towards girl child education of dowry culture and reservation of seats for woman in local panchyats. And several of these initiatives have helped in empowerment of women. Nevertheless a lot of work is still to be done in the direction including the public and private domain. Women's Day in India is celebrated to make people aware of all the progresses that have been done till date and the work that still needs to be alone.

LEAVE NO WOMAN BOUND :
The Mum Whose Heart Knows No Limit

Sherya Chowdhury
Student

As a woman who has taken the three daughters of deceased best friend under her own wing, while caring for children of her own, the theme of this year's International Women's Day rang especially true for Warwick Single mother Suzette Beng.

"LEAVE NO WOMEN BEHIND" was the topic women across the globe reflected on, but it's a motto Ms. Benz has lived by her whole life.

Running a dance school, moving house, working full time, caring for five children as a single mother, and all the loss of her best friend, many are in owe of how Ms Benz holds it all together.

But like other resilient women throughout our country community, Ms Benz says sometimes you just have to make it work.

> "There are plenty of times where you just want to fall on the floor in a heap and cry, but I think women know that people and kids rely on them and they solider on."

But Ms Benz wouldn't be the person she is today without the central role model in her life.

A heart that big is something Ms Benz could only have inherited from her mother, Larraine Goldspink.

From a young age, she was surrounded by an endless stream of kids her family took in as the operations of the E J Portley Pool in Warwick.

"My mother would always have 50 different kids over, all having a pool party," Ms Benz recalls.

Just like Larraine, there's always room for kids in my Ms Benz's heart.

"If there is a child in need that's all that matters", she said.

"No one deserves to feel unloved & unwanted."

But her generosity really proved it had no limit when a tragic twin of events befell her friends late last year.

In October 2017, one of Ms. Benz's closest companions, Stacey Rodgers, was diagnosed with pertioneal misothelioma, a rare and aggressive type of stomach cancer that took her life three months later.

As the single mother of three teenage daughters and two sons, the illness could not have been harder on Ms. Rodgers.

But in the final stages of her life, the two families became so close they even merged under one roof & Ms Benz's household doubled in life as she moved to take care of Ms Rodger's children when she passed away.

Two months after her friend's funeral, Ms Benz, Breanna, Jack, Emily, Natalie & Angella all are findint their footing in a new house & discovering solidarity in each other's companionship.

> "Moving into a bigger to accomodate us all has been a new beginning and a fresh start for us to all work as one", Ms Benz said.
>
> "I remember Ange walked into our house on the first day and went 'oh my god look at all the food' ..... she was just rapt that the place was just home, we made it home straight away," she said.

Alongside running a family and working full time, Ms Benz also manages to head a fun-based, not-for-project dance school.

She started Move School of Dance five years ago & still loves her afternoons teaching young children to jump for enjoyment and build confidence in their won skin.

"I have seeing the kids come in and they have their little outfits ..... it's cute & it's rewarding," she said.

"At the end of the day you know they are out enjoying themselves, not sitting in front of electronics."

As the guardian of four teenage girls, Ms Benz is all too families with the

challenges social media presents to the younger generations.

"It is really hard on young girls three days", she said.

"My daughter was bullied a lot in school at one point, and that can lead into depression and anxiety and not wanting to go to school."

Ms Benz said the antitode to the pressure of society was guidance, acceptance and a lot of cuddles.

Luckily there is no shortage of the latter in Ms Benz life, one of the upsides of being a single parent.

"It is hard not to have that person to turn to for help and went but the end of the day I get the extra love and suppourt from the kids ..... so it sons of mellous itself out."

As people across the would have reflected on the resilience and solidarity of women, Ms Benz says she is all for equality but thinks women still have something different about them.

"We are kind-hearted & we are soft", she said.

"Everyone knows when you go to Mum for a hug".

হঠাৎ দেখা

সৌরদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়
ছাত্রী

অফিসটা বড্ড বার বেড়েছে। শনি রবিবারেও ছুটি দেবেনা। বস্-এর তলব মিটিংটাতে থাকতে হবে। যেতে হবে শিলিগুড়ি। তা বেড়িয়ে পড়লাম কলকাতা থেকে। একা মানুষ, বাবা মাকে নিয়ে থাকি। না আছে সংসারের টান, না আছে কোনো পিছুটান। তা খুব একটা রাগ হয়নি বস্-এর উপর। শুক্রবার রাতে বেড়িয়ে পড়লাম। নভেম্বর মাস, ঠান্ডাটা বেশ লাগছিল, তবে ট্রেনে কষ্ট হয়নি খুব একটা। সারারাত ভালোই ঘুম হলো। সকালে জলপাইগুড়ি আসতে ট্রেনটা দাঁড়ালো। স্টেশনে নেমে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিলাম। ট্রেনে উঠে বসেছি সবে, হঠাৎ করে একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম। গন্ধটা খুব চেনা, মুখটা ঘোরাতেই দেখলাম পাঁচ বছর আগের ফেলে আসা অতীত আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার অতীত মানে আমার প্রাক্তন স্ত্রী দেবযানী। অবশ্য এদেশের আইন অনুযায়ী ও আমার অতীত। তবে ও আমার জীবনের আজও আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। আজও সেই আগের মতনই আছে। পরনে ছিল নীল রঙের একটা শাড়ি। ওটা আমি ওকে আমাদের বিয়ের প্রথম পুজোতে দিয়েছিলাম। চুলটা হালকা বিনুনি করা। ভারি সুন্দর লাগছিল। ব্যাগটা উপরে রাখতে গিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল। ও বেশ অবাক হলো। প্রথমে না চেনার ভান করল। তারপর কিছুক্ষণ পর নিজেই প্রশ্ন করল, ''কেমন আছো তুমি?'' আমি খানিকটা হেসে বললাম, ''যেমন তুমি রেখে গেছিলে।'' ও হাসল। তারপর আবার সেই নীরবতা। আমি সেই নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞাসা করলাম, ''তুমি?'' ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''আছি''। আমি বললাম, ''কোথায় আছো তুমি এখন? কোথায় নার্সিং-এর চাকরি করছো?'' ও বলল, ''তোমার জেনে কি হবে আর।'' ''না, এই আর কি জিজ্ঞাসা করছিলাম।'' আমি বললাম। ও মুচকি হেসে বলল, ''আনন্দলোক ইনস্টিটিউট অফ্ নার্সিং কলেজে পড়াই''। ''বাহ্, অবশেষে তোমার স্বপ্নটা সত্যি হল।'' ''সেই জীবনে কত স্বপ্নই তো দেখলাম; সবই ভেঙে গেছে; তাই এটাকে আর স্বপ্ন বলব না; এটা শুধুমাত্র আমার পেশা।'' বুঝলাম ভালোই অভিমান করে আছে, পাঁচ বছরের ভুল বোঝাবুঝি অভিমান সবই তো চাপা আছে। ভাবলাম এক মুহূর্তের জন্য যদি সবকিছু মিটে যায়। ঘড়ি দেখলাম, শিলিগুড়ি চলেই এসেছে। ভাবলাম ওকে বলি স্টেশনের কাছাকাছি কোন কফি হাউসে গিয়ে যদি বসি, যদি কিছুটা মেটানো যেত। কারণ আজ হঠাৎ পাঁচ বছর পর মনে হলো সব ভেঙে আবার নতুন করে শুরু করি। তা বেশ সাহস নিয়ে বললাম, ''একটা কথা বলার ছিল; মানে ইয়ে বলছি তুমি কি খুব ব্যস্ত?'' ও বলল, ''মানে?'' না আসলে ভাবছিলাম যদি শিলিগুড়ি নেমে স্টেশনের কাছাকাছি কোনো কফি হাউস-এ বসার কথা ভাবছিলাম।'' পাঁচ বছর পর আজ হঠাৎ কফি হাউস-এ বসার কথা ভাবছ আমার সাথে?'' ''না এমনি''। তোমার অসুবিধা থাকলে ঠিক আছে।'' বুঝেছিলাম অনেক অভিমান জমে রয়েছে আমার জন্য। তা স্বাভাবিক। পাঁচ বছর আগে ওকে অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়েছে আমার জন্য। আমি আর কথা বাড়ালাম না। শিলিগুড়িতে

নেমে ও চলে যাচ্ছিল। আমি ডেকে বললাম, ''একবার কি যাওয়া যেতে পারে না?'' ও কিছু বলল না। খালি বলল, ''সোয়েটারটা পরে নাও ঠান্ডা আছে।'' আমি অবাক হলাম। আজও খেয়াল রেখে যাচ্ছে।

তারপর ও বলল, ''দেখো অনুরাগ, আমি জীবনের অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। যেদিন সব থেকে কাছে পাওয়ার কথা ছিল, সেদিন তোমাকে পাইনি, আমাকে ভুল বুঝেছিলে। সেদিন যখন থাকোনি তাহলে আজ আর দয়া করে বল না ফিরে যেতে, প্লিজ্ অনুরাগ। যা ছিল না কখনো নিজের, তাকে বারবার নিজের করার চেষ্টা করেছি। এইটাই ভুল। আর আজ আমি সেই ভুলের মাশুল গুনছি। যাকগে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চলি।''

আমি দেখলাম ওর চোখে জল। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ''কাঁদছো যে।'' ''না আসলে যে অতীত ভোলার চেষ্টা করেছি তা আজ আবার চলে এলো।'' আমি আর কিছু বললাম না। বুঝেছিলাম অনেক অভিমান ওর। ও যদি এইভাবে ভালো থাকে, তাহলে থাকুক। ও বেরোনোর আগে বলল, ''এতো বেশি সিগারেট খেয়ো না, এমনি হাই প্রেসার তোমার, ওষুধগুলো ঠিকঠাক খেয়ো।'' ''আজও সব মনে আছে দেখছি।'' ''ওগুলো ভোলার চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না। আমি আসছি।'' আর কথা বাড়ালাম না। ওকে যেতে দিলাম। চিরদিনের মতো যেতে দিলাম। ও খালি একবার পিছন ফিরে দেখল। ও এগিয়ে গেল। বুঝে গেছিলাম আমার আর ওর রাস্তা চিরদিনের মতো আলাদা হয়ে গেছে। খালি মনে মনে বললাম, তুমি ভালো থেকো। তোমাকে আমি আজও ভালোবাসি। জানি তুমিও বাসো। একটা গান তখন খালি হঠাৎ করে কানে বেজে উঠল, 'চোখের আড়াল হও, কাছে কিবা দূরে রও, মনে রেখো আমিও ছিলাম।''

জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড - একটি আলেখ্য

অনুষ্কা মিত্র
ছাত্রী

বিদায় ১৪২৫, স্বাগত ১৪২৬। বাঙালীর জীবনে এগিয়ে এল আর একটা নববর্ষ। সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে নতুন বছরের শুভারম্ভ হোক।

ঘটনাক্রমে ২০১৯ অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের শতবর্ষ পূর্তি বৎসর। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল, রবিবার অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগে জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র ভারতীয়দের ওপর গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল।

১৯০ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) পদানত ভারতবাসী ব্রিটিশদের নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত। দেশ জুড়ে চলছে নানা আন্দোলন। লর্ড চেমসফোর্ড মন্টেগু - চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তন করেন। একে ভিত্তি করে ঋদ্রড্ঠ দ্র জ্জ—ত্মথ ঙত্নঠ নামে আইন পাশ হয়। এর ফলে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা, যথেচ্ছভাবে দন্ডদান করা, দেশবাসীকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা প্রভৃতি বিধান চালু হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশপ্রেমিক ভারতবাসীদের ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলত। ‘সন্ত্রাসবাদী’দের কার্যকলাপ দমন করার উদ্দেশ্যে আইন সভায় দুটি আইন পাশ করা হয়েছিল। যে কমিটি এই আইন পেশ করেছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন রাওলাট। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে পাঞ্জাবে যে আন্দোলনের সূচনা হয় তার ফলস্বরূপই ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড। দুজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সত্য পাল ও ডঃ বিচলিউকে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নির্বাসিত করা হয়। এঁদের গ্রেপ্তারে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অমৃতসর শহরে শোভাযাত্রা বের করে। মানুষ টাউন হল, পোস্ট অফিসের ওপর হামলা চালায়। শহরের অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে দেখে ব্রিটিশ সরকার সেনা তলব করে এবং জেনারেল ডায়ারের ওপর শহর দেখাশোনার দায়িত্বভার তুলে দেয়। ১২ই এপ্রিল, ডায়ার অমৃতসরের দায়িত্ব গ্রহণ করেই নির্দেশ দেয় - কোনো জনসভা করা যাবে না, জমায়েত করা যাবে না। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতা নিষেধাজ্ঞার ভ্রূক্ষেপ না করে জালিনওয়ালাবাগে সন্ধ্যায় বৈশাখী উৎসবে দশ হাজারেরও বেশি সমবেত হয়। কোনো রকমের সতর্কবাণী না দিয়েই ডায়ারের উদ্ধত বাহিনী নিরস্ত্র জনতার ওপর প্রায় দশ মিনিট ধরে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ঐ বাগের চারপাশের পাঁচিল উঁচু থাকায় এবং ওখান থেকে বেরুবার একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ থাকায় মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যু বরণ করে।

এই হত্যাকান্ডে কতজনের মৃত্যু হয়েছিল সঠিকভাবে বলা না গেলেও কারু কারু মতে ৩৭৯ জন মারা, সহস্রাধিক আহত। কারু কারু মতে আড়াই হাজারেরও বেশি মারা যান। আহতেরা সারা রাত বাগেই পড়েছিল কারণ সান্ধ্য আইন জারি থাকায় কেউই বাড়ির বাইরে আসতে পারেনি। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা যায় নি। এদিনেই আহত হয়েছিলেন এক বালক। আহত অবস্থায় তীব্র প্রতিশোধের আগুন নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে ১৯৪০

সালের ১৩ই মার্চ খোদ লন্ডনে ও ডায়ারকে হত্যা করে বুকের জ্বালা জুড়িয়েছিল। এরপর সে ধরা পড়ে এবং ১৯৪০ সালের ৩১শে জুলাই তার ফাঁসি হয়। এই অকুতোভয় বীরের নাম উধম সিং।

ফাঁসির আগে উধম সিং বলে - আমি কোনো অবস্থাতেই ভয় পাই নি। আমি আমার দেশের অসহায় মানুষগুলোর অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখেছি। সহ্য করেছি বিদেশীদের অমানুষিক অত্যাচার। একজন দেশরক্ষী হিসেবে মৃত্যুর চেয়ে বড় কোনো সম্মান আমি কখনই আশা করিনি।

জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড মানবসমাজকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। একজন ব্রিটিশ মহিলা অত্যাচারিতা হয়েছেন - এরকম গুজবের শাস্তি স্বরূপ ভারতীয়দের পাঞ্জাবের রাস্তায় ব্রিটিশদের সামনে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়। শহরের বুকে হিংসার উন্মাদনা দেখে ব্যথিত গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের খবর রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছতে দেরী হয়েছিল। খবর পাওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করে লেখেন - সম্মানের উপাধি অপমানের জ্বালায় বিদ্ধ হয়ে ত্যাগ করে দেশপ্রেমিকদের পাশে দাঁড়াতে চাই।

জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ধারণা হয়েছিল অকথ্য নির্যাতনের ফলে ভারতীয়রা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আন্দোলন তুলে নেবে, কিন্তু বাস্তবে ফল হয়েছিল বিপরীত। এই হত্যাকান্ডের আগে স্বাধীনতার আন্দোলন মূলত শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এর পরেই দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের প্রশ্নে উত্তাল হয়ে ওঠে। আন্দোলনের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আন্দোলনের মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে দেশীয় নেতৃত্বের একাংশ অহিংসার পথে অগ্রসর হতে চাইলেন, কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকল।

লেনিন অমৃতসরের এই হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিলেন - ''ব্রিটিশ ভারত এইসব (মুক্তি আন্দোলনরত) দেশের মস্তকস্বরূপ, সেখানে একদিকে বিপ্লব আনুপাতিকভাবে পরিপক্ক হয়ে উঠছে, শিল্প ও রেলওয়ে প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা বাড়ছে এবং অন্যদিকে ব্রিটিশরা বর্বরতা ও সন্ত্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি করছে। তারা সর্বকালের তুলনায় ঘন ঘন গণহত্যা (অমৃতসর) ও ব্যাপক লাঠি চালনা ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে।

কেবলমাত্র ভারতবর্ষই নয়। বিশ্বের বহু দেশ ব্রিটিশদের এই নৃশংসতার নিন্দায় সরব হয়। একথা স্বীকার করতে হবে যে এধরণের জঘন্য আঘাতের প্রয়োজন অবশ্যই ছিল কারণ এর পরেই আপামর জনসাধারণের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়, তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে বিদেশীদের অবিলম্বে দেশ থেকে বিতাড়িত করতেই হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের পয়লা নম্বরের শত্রু।

নববর্ষের বাংলার কোথাও কিংবা দেশের অন্য কোথাও জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের কথা ২০১৯-এ দেখতে পাইনি। নীরবে জালিনওয়ালাবাগের জঘন্যতম ঘটনার শতবর্ষ পেরিয়ে গেল।

নারী

নীলাঞ্জন সাহা
ছাত্র

নারী ভোটাধিকারের এক শতাব্দী পরেও 'যাও বিবিজান, ছাপটা কিসে দেবে মনে আছে তো'?

'বেটি কোন সুইচটা টিপতে হবে, আর বলতে হবে'?

দুটো কথাই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাহিরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ কলকাতার পঞ্চাশোর্ধ শিক্ষক আনিজুর ইসলামের। তবে তার মেয়ে জাহানারা কলেজের বন্ধু সুধীরের সমর্থনে দু-চার পা এক মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলো। অষ্টাদশী এই তরুণীর বাবা সুধীরের বিপক্ষ দলের কর্মী। সেদিন তার পিঠে তৈরী হওয়া বেল্টের দাগটা আজ দু-সপ্তাহ বাদেও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি।

নারী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেশ কয়েক শতক আগে শুরু হলেও ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত কিন্তু এই মাত্র ১০০ বছর আগে। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে হাতে গোনা, কিছু রাষ্ট্র নারী ভোটাধিকার সমর্থন করলেও আমেরিকা-কানাডা সহ বহু দেশে ১৯২০ সালে নারী ভোট দানের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়। তবে ২০১৫-এর ডিসেম্বরে সৌদি আরবের মহিলারা প্রথমবারের মতো নির্বাচনের ভোটা দেওয়ার সুযোগ পান।

ভারতের নারীদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের প্রকৃত অধিকার আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তা জাহানারার মতো মেয়েদের ব্যক্তিগতভাবে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে ভোটদানের পথে এক বড় অন্তরায় তবে একটু সাহস দেখাতে পারলে সে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে সে গোপন ব্যালট বাক্সে।

শহর অঞ্চলের শিক্ষিত গৃহবধুরা খুবই কম রাজনৈতিক হিংসার শিকার হন। তবে গ্রাম অঞ্চলে নানা অত্যাচার ও অপমানের শিকার হয়েও পারিবারিক চাপ তাদের মুখ বন্ধ করে দেয় প্রতিবাদের ভাষার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেরালার অস্পৃশ্য জাতির মহিলাদের উপর ১৯২৪ সাল অবধি 'ব্রেস্ট ট্যাক্স' লাগু ছিলো। আজ হয়ত ভাবতে অবাক লাগবে যে কোনো নারী তার উর্দ্ধাঙ্গ পোশাকে আবৃত করে প্রকাশ্যে বেরোলে তাকে তার বিনিময়ে অর্থ দিতে হত। তবে নানগেলি কর দিতে অস্বীকার করে প্রতিবাদ স্বরূপ কর সংগ্রহকারীকে ধারালো কাস্তে দিয়ে শরীর থেকে স্তনদ্বয় ছিন্ন করে কলাপাতায় প্রদান না করলে আজও আমরা হয়তো এই করের সাক্ষী থাকতাম। মেয়েদের সম্মান নিয়ে আমরা ভ্রষ্ট, একটি পুরুষ যদি একটি নারীর হাত ধরে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু শরীরের বিশেষ কিছু জায়গায় তার অনুমতি ছাড়া বল পূর্বক কোনো পুরুষ স্পর্শ করলে আমরা চিহ্নিত করে দিই তার সম্মানহানি হয়েছে। তাকে আমরা আলাদা করে দিই সমাজের মূল স্রোত থেকে। আমরা যদি মেয়েদের ঘরে বন্ধ থাকা ও নানা বঞ্চনা এবং সবশেষে তার থেকে মুক্তি প্রচেষ্টাকে যদি একটি তিন ঘন্টার চলচ্চিত্র হিসাবে দেখি ততে তার মাত্র শেষ ১০ মিনিটে এই পরিবর্তনের সূচনা ও শেষ দুই মিনিটের বর্তমানের আংশিক পরিবর্তিত সমাজকে দেখতে পাবো, যেখানে নারী-পুরুষ সমান সমান আমরা সেই ভাগ্যবান যারা উচ্চশিক্ষায় একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে নারীকে পাই। নারীদের পাশে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পাই। পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে, বদলাবে। তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এখন প্রশ্ন আমি বদলের পক্ষে না বিপক্ষে দাঁড়াবো। প্রাণী জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কি? সব দেখে, শুনে, বুঝেও চোখ কান মুখ বন্ধ করে রাখবো। নাকি নিজের বান্ধবী, আত্মীয়া, পরিচিতা কোনো নারীকে এই পুরুষবাদের থেকে মুক্তি দিয়ে সাম্যবাদের পথে হাঁটাবো।

প্লাস্টিক দূষণ

ত্রিয়াশা গিরি
ছাত্রী

সেই আদিমকাল থেকে আমরা অনেকগুলি যুগ - যেমন - লৌহযুগ, প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ অতিবাহিত করার পর গত এক দু দশক আগে মহাধুমধাম সহকারে ধরাতলে আবির্ভূত হয়েছে প্লাস্টিক যুগ।

কিন্তু সমস্যর বিষয় হল ওই যুগগুলির তুলনায় এখন এই উন্নততর যুগে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে আমাদের হজম বা বদহজম করতে হচ্ছে প্লাস্টিক দূষণ। যেহেতু প্লাস্টিকের যুগ তাই জনজীবন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত প্লাস্টিক ব্যতীত চিন্তা ভাবনা করতে পারে না। শয়নে স্বপনে প্লাস্টিক ছাড়া গতি নেই। এই কিছুদিন আগে অবধিও আমরা শুনে এসেছি যে ''দাদা একটা প্লাস্টিক হবে?'' বা ''পলি হবে''। আমার কাছে ব্যাগ নেই। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা যে কী বিপর্যয় ডেকে আনছি তা আমরা নিজেরাও জানতাম না বা অনেক সময় জেনেও না জানার ভান করতাম।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক এই পলিথিন বা প্লাস্টিক জিনিসটি আসলে কী। প্লাস্টিক হল সিনথেটিক বা সেমি-সিনথেটিকও নিম্নগলনাঙ্ক বিশিষ্ট পদার্থ যা তাপীয় অবস্থায় যে কোনো আকার গ্রহণ করতে পারে এবং পুনরায় কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাধারণত প্লাস্টিক দূষণের জন্য দু-ধরণের প্লাস্টিক দায়ী - একটি হল মাইক্রো প্লাস্টিক যা সাধারণত মেগা বা বৃহৎ হিসাবে পরিগণিত আর অপরটি হল ম্যাক্রোপ্লাস্টিক।

প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব এর জন্য জনজীবন সহ সমগ্র জীবকুল এবং পরিবেশ ত্রাহি-ত্রাহি রব ছড়াচ্ছে। প্লাস্টিকের পাত্রে রাখা পানীয় ও খাবার নিয়ে মানুষের মধ্যে এখনো কোনোরকম সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। এর প্রভাবে ধীরে ধীরে শরীরে বাসা বাঁধছে ক্যানসার, স্নায়ুরোগ, ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি, হৃদপিন্ডের সমস্যার মতো বিভিন্ন কঠিনতর রোগের। চিকিৎসকদের মতে প্লাস্টিকের বোতল, শিশুদের দুধের বোতল, প্লাস্টিকের পাত্রের খাবার রেখে মাইক্রোওয়েভ অভেনে গরম করা বা প্লাস্টিকের মোড়কে বিক্রি হওয়া খাবার এইসব বহু জিনিসের ব্যবহার ডেকে এনেছে নানা মরণদায়ী রোগ। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও মানুষ উদাসীন থাকছে এইসব বিষয়ে। বোতল বা পাত্র তৈরী করার জন্য পলিভিনাইল ক্লোরাইডকে (পিভিসি) নরম করা হয় থ্যালেট ব্যবহার করে। এই পিভিসি-র ইতিহাসটা খুব একটা ভালো না। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়ার পিভিসি কারখানার কর্মীদের মধ্যে এক সময়ে ক্যানসারের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। থ্যালেটও অবশ্য পিভিসি-র থেকে কিছু কম যায় না। বিদেশের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এই রাসায়নিকটি মানব শরীরে নিয়মিত ঢুকতে থাকলে স্থূলতা, টাইপ ২ ডায়াবিটিস, ব্রেস্ট ক্যানসার, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগের আগমন ঘটতে পারে। পলিভিনাইল ক্লোরাইড শরীর প্রবেশ করলে শিশুদের হাঁপানি, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস ও মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে। এ দেশে প্রতিবছর ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যাটি দিন দিন বেড়েই চলেছে ৪.৫-৫ শতাংশ

হারে। যদিও চিকিৎসকদের মতে আসল চিত্রটা আরো আরো ভয়াবহ। কারণ গ্রামের পরিসংখ্যান সেভাবে সামনেই আসে না। প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তার সময় এসেছে আর উদাসীনভাবে চললে হবে না কারণ এগুলো কোষের সাইটোপ্লাজম, মাইটোকনড্রিয়া এবং কোষের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। শেষ করে দেয় শরীরে স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া, প্লাস্টিকের কাপ, প্লেট, বাটি ও ট্রেতে ব্যবহৃত পলিস্টাইরিন এর থেকে স্টাইরিন যোগ নিঃসৃত হয়। যার প্রভাবে রক্তের ক্যানসারের আশঙ্কা থাকে। লিভার, কিডনি ও পাকস্থলীর ক্ষতও হতে পারে।

পলিথিন বা প্লাস্টিক এর বর্জ্য মাটিতে ফেলার ফলে মাটির তার উর্বরতা শক্তি ও মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলছে। মাটিতে বিভিন্ন অনুজীব বাস করে যারা প্লাস্টিক অণুর ভাঙনে সাহায্য করে। এই সকল অনুজীবগুলির মধ্যে ''সিউডোমোনস'', ''নাইলন খাদক ব্যাকটেরিয়া'', ''ক্লাডো ব্যাকটেরিয়া'' অন্যতম। এই সকল ব্যাকটেরিয়া ''নাইলোনেজ'' এনজাইমকরণের মাধ্যমে নাইল অণুকে ভেঙে ফেলে। জীবাণু বিয়োজী প্লাস্টিক ভাঙনের মাধ্যমে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। মিথেন একপ্রকার গ্রীনহাউস গ্যাস। এটি বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী।

২০১২ সালে, গবেষণার মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের সমুদ্রে আনুমানিক ১৬৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য আছে, ''নারডল'' নামক একপ্রকার প্লাস্টিক যা সকলকে প্রায় অবাক করে দিয়েছে। ''নারডল'' হল এমনই একটি শিল্প জাত প্লাস্টিক যা প্লাস্টিক পণ্য বা কার্গো শিপ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। প্রচুর পরিমাণে নারডল সমুদ্রের জলে পতিত হয়। যত দিন যাচ্ছে এই প্লাস্টিক পদার্থের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এর ফলে প্রতিনিয়ত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ যেমন - বায়োস ফেনল, পলিস্টিরিন ইত্যাদি পরিশ্রুত হয়। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে সমুদ্রের জলে ৫ ট্রিলিয়নের বেশি প্লাস্টিক ভেসে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটছে। সামুদ্রিক কচ্ছপের মৃত্যু প্লাস্টিক দূষণের কারণে ঘটছে। সামুদ্রিক কচ্ছপের সাধারণত খাদ্য হল জেলিফিস ও সমুদ্রের কীট। জেলিফিসের আকার ও আকৃতি প্লাস্টিক ব্যাগের মতো হওয়ায় কচ্ছপ ভুল করে প্লাস্টিকের ব্যাগ ভক্ষণ করে এবং এতে তাদের খাদ্য নালিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা ধীরে ধীরে মারা যায়। এর চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিমি। সমুদ্রের তিমির পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক পাওয়া গিয়েছে। প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবনকে লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে।

এখন মূলকথা হল এই প্লাস্টিক মহাযুগ মনুষ্য সৃষ্টি যুগ। তদুপরি মনুষ্য প্রসূত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ এহেন প্লাস্টিক দূষণ। এমত অবস্থায় মনুষ্য ব্যতীত এর সমাধান করবার বুকের পাটা বা অসীম ক্ষমতা সমগ্র জীব বা জড়কুলে আর কার বা আছে? সর্বোপরি ''সবার উপর মানুষ শ্রেষ্ঠ''। তার ওপর আবার প্লাস্টিকের সিলিং ফ্যান।

সমগ্র তথ্য অনুযায়ী আমরা এটা ভাবতে বাধ্য হই যে মনুষ্যকুল সাধনা, আরাধনা, গবেষণা, নীতি-নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, আন্তঃ ও আন্তর্জাতিক বৈঠকীকরণ, জনসচেতনতার বৃদ্ধি ইত্যাদি করবার সাথে সাথে যদি আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি লাভে উদ্যোগী হন তবেই প্লাস্টিক দূষণ নাম নটেগাছটি মুড়োবে বা মূলসহ উৎপাটিত হবে।

কবিতা গুচ্ছ

মৌমিতা ঘোষ
ছাত্রী

(১)

দিনের শেষে যখন সন্ধ্যা নামতো ব্যস্ত শহরের বুকে,
তখন তোর বাড়ির ঝুল বারান্দায় সেই ক্ষীণ আলোয়
দুজনায় অতৃপ্ত ইচ্ছারা নির্জন আঁধারে মিশে একাকার
হত সময়ের আখাড়ায়, শেষ আকাশে স্নিগ্ধ দৃষ্টির
উষ্ণতায় ক্রমশ পরিচয় হারাত অজান্তে,
মোহনায় আছড়ে পড়ত অজস্র ঢেউ। আজ সেই শতাব্দীর
অস্পষ্ট গল্পেরা নিছকই ইতিহাস গড়েছে মাত্র।
গোধূলি হারিয়েছে দীর্ঘ ঝাপসা স্বপ্নের ঘোরে।
ক্রমে বিশ্বাস নামে ছোট্ট একটি আলো
অন্ধকার গ্রাস করেছে।

(২)

আমি শীতের শেষে ঝরা এক ধূসর পাতা,
অনিশ্চিত স্থায়িত্বতা,
পাল্টা হাওয়ায় কাটা বেরঙীন ঘুড়ি
শেষ আকাশে মিশে যাওয়া এক গোধূলি।
চোখের পাতায় কালো মেঘ জমাট বাঁধা
অন্তরে অবিশ্রান্ত বারিধারা।
গাঢ় অন্ধকার আষ্টে-পৃষ্ঠে আচ্ছন্ন,
আঁকড়ে ধরে অতীতের স্মৃতি ও অন্যান্য।
বসন্তে রঙিনের ছোঁয়ায় তোমায় রাঙাতে পারবনা,
সাদা কালো আমার এ জীবনে রঙের ছোঁয়া যে মানা।

(৩)

তুই নামে স্মৃতিচারণ,
আজ তোর স্মৃতি বিষদগ্রস্থ দিচ্ছে আমায় উপহার।
প্রচ্ছেদ থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি ভাঙন,
তুই আজ ডায়েরীতে শব্দকল্প মাত্র আমার।।
সাদা পৃষ্ঠা বর্ণময় হতে পারে
এমন কিছু অক্ষর তুই আজ।

বর্ষামুখর একটি আশ্চর্য সন্ধ্যা

শুভাঙ্গী দে
ছাত্রী

বারাসাতের একটি মফঃস্বল এলাকায় থাকে ইন্দ্রাক্ষী। এটি তার পূর্বপুরুষের ভিটে। মা বাবা গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। ফলে এখানে সে একাই থাকে। তার বাড়ির আশেপাশে খুব একটা বেশি বাড়িঘরও নেই। ইন্দ্রাক্ষী সকালে অফিসে যায় আর সন্ধ্যায় বাড়ি এসে বাড়ির কাজকর্ম শেষ করে গল্পের বই পড়ে। গল্পের বই পড়াটা তার নেশা বলা যায়।

এরকমই এক সন্ধ্যায় মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হল। সে তখন একটা রহস্য রোমাঞ্চের বই পড়ছিল। সে বইটিকে নামিয়ে রেখে দরজা জানলা বন্ধ করতে গেল। দমকা হাওয়ার জন্য দরজা-জানলাগুলো দুমদাম শব্দ করে বারবার বন্ধ-খোলা হতে লাগল। সেই তাড়াতাড়ি দরজা-জানলা বন্ধ করে আবার বই পড়াতে মন দিল। ঘরের ভিতর চারিদিক এখন একদম নিস্তব্ধ শুধু বাইরের বৃষ্টির আর মেঘ ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সে গল্পের বই পড়তে মগ্ন হয়ে গেল। গল্পের একটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক জায়গা পড়তে পড়তে এমন সময় হঠাৎ সে আওয়াজ পেল কোথায় একটা জানি স্টিলের কিছু পড়ে গেল। খালি নিস্তব্ধ ঘরে সেই আওয়াজটা ঘুরতে লাগল। সে চমকে উঠল। তখনই সে শুনতে পেল কারা যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কী বলছে। কারণ আওয়াজটা খুবই ক্ষীণ। ইন্দ্রাক্ষী সাহসী মেয়ে, সে ভূতে বিশেষ ভয় পায় না। কিন্তু আজ সে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেল। তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। সে মন দিয়ে শুনতে লাগল আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে, সে সেই দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। এমন সময় কারেন্ট চলে গেল। সে আরও ভয়ে পেয়ে গেল। সে আবার ঘরে ঢুকে হাতড়ে নিজের মোবাইলের টর্চটা জ্বালালো, তারপর সে আবার শব্দের পিছু করতে লাগল। সে দেখল রান্নাঘরের দিক থেকে আওয়াজটা আসছে। সে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। তারপর সে রান্না ঘরের দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল। ঘরে টর্চ ফেলতেই সে যা দেখল তার মাথা ঘুরে গেল। দেখল রান্নার ঘরের জানলা সে তাড়াহুড়োর চোটে বন্ধ করতেই ভুলে গেছে। তার ফলে বাইরের হাওয়ায় একটা স্টিলের বাটি নিচে পরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর বাইরের হাওয়ার কোঁচ কোঁচ আওয়াজের সাথে রান্না ঘরের বাইরে যে পেয়ারা গাছটা আছে, হাওয়ার ফলে পাতার আওয়াজ মিশে যাওয়ায় এমন একটা ফিস্‌ফিস্‌ -এর মত শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, শুনলে মনে হচ্ছে কারা যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে।

এই অবস্থা দেখে ইন্দ্রাক্ষী হাসবে না নিজের বোকামির উপর রাগ করবে সেটাই বুঝে উঠতে পারল না।

তিনকন্যা

অধ্যাপিকা মিতাসী দাস পাইন
বাণিজ্য বিভাগ

যে মানুষটি একাই আমাদের বাংলা সাহিত্যকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন, অবিসংবাদিতভাবে জীবনের এমন কোন দিক নেই, অনুভূতি নেই যে এই মহানপুরুষটির লেখনিতে উঠে আসেনি। বিশ্বজোড়া মানুষকে যে মহান মানুষটি একার কীর্তিতেই এতগুলো বছর মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনকন্যা ও জামাতাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের খতিয়ানটি আর একবার দেখার চেষ্টা করি।

কবি রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র ১৯ বছরের মতো (১৮৮৩-১৯০২ খ্রিঃ), এর মধ্যে তাঁর পাঁচজন পুত্র-কন্যার জন্ম হয়। ১৮৮৩ সালে বিবাহের সময় ভবতারিণী দেবীর (মৃণালিনী দেবী) বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর, আর রবীন্দ্রনাথের বয়স ২২ বছর। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মাত্র ২৯ বছর বয়সে কবি পত্নি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় যক্ষ্মারোগে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪১ বছর। তিনি আর দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ বা বিবাহ করেননি।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ বা রথী (জন্মঃ ২৭ নভেম্বর, ১৮৮৮ - মৃত্যুঃ ৩রা জুন, ১৯৬১) দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন (৭৬ বছর)। তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদে বহুদিন বহাল ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ বা শমী (জন্মঃ ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৬-মৃত্যুঃ ২৩ নভেম্বর, ১৯০৭) মুঙ্গেরে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মাত্র ১০ বছর ১১মাস বয়সে কলেরা রোগে ২৩শে নভেম্বর ১৯০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন মুঙ্গেরে পৌঁছান তখন সব শেষ। পুত্র নয়, এখানে আমরা তিনকন্যার ঘর-সংসারের কথাই মূলতঃ বলতে চাই।

প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা বা বেলা (জন্ম ঃ ২৫ অক্টোবর, ১৮৮৬ - মৃত্যু ঃ ১৬ মে ১৯১৮) - মাধুরীলতার স্বামীর নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র। শরৎচন্দ্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ তে প্রথম স্থান অধিকারী। ১৮৯৪ সালে আইন পাশ করে মজঃফরপুরে ওকালতি করছিলেন। কন্যার বয়সের আন্দাজে জামাতার বয়স বেশিই। পাত্রের অভিভাবিকা শরতের মা কুড়ি সহস্র মুদ্রা (২০,০০০টাকা) বরপণ হেঁকেছিলেন। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ সেজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থের উপরেই নির্ভর করতে হতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ের আগে বরপণ দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। যাইহোক দুইপক্ষের অনেক চিঠি চালাচালি ও লক্ষ বাক্যক্ষয়ের পর ১৯০১ সালের জুলাই মাসে বিবাহ স্থির হয়। বিয়ের আগে জামাতাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে হয়েছিল। মহর্ষি বিয়ের পর জামাতাকে দশ সহস্র (১০,০০০ টাকা) মুদ্রা যৌতুক দেন। বিয়ের সময় মাধুরীলতার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ শরৎকে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন প্রতিমাসে জামাইকে খরচ পাঠাতে হতো ১০ পাউন্ড করে, সে সময়ের হিসাবে ১৫০টাকা। ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে চারবছর (৪ বছর) তিনি ঘরজামাই ছিলেন। এই ঠাকুরবাড়িতে শরৎকুমারের সঙ্গে কবির ছোট জামাতা নগেন্দ্রনাথের বিবাদের সূত্র ধরে শরৎকুমার বাড়ি ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে ১৯১২ সালে শ্রীরামপুরের পৈতৃক নিবাসে চলে যান। এই বিবাদের ফলে দুই বোনের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎকুমার চক্রবর্তীর

সম্পর্কের ইতি ঘটে। পিতা ও স্বামীর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে বুকভরা অভিমান নিয়ে মাধুরীলতা মানসিক ও শারীরিকভাবে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছায়। মাধুরীলতা নিঃসন্তান ছিলেন। মৃণালিনী দেবীর মতো মাধুরীলতাও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়, চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীরামপুরে গিয়ে মাধুরীলতার অসুখ আরও খারাপের দিকে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন গাড়িতে করে গিয়ে মেয়েকে দেখে আসতেন। বাবার হাত ধরে মেয়ে বসে থাকে। তখন জামাতা শরৎকুমার চক্রবর্তী টেবিলের ওপর পা রেখে সিগারেট খেয়ে শ্বশুর রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপমানকর মন্তব্য করতেন। আর সে অপমান নীরবে সহ্য করে রবীন্দ্রনাথ দিনের পর দিন মেয়েকে দেখতে যেতেন। একদিন দেখতে গেছেন মাধুরীলতাকে কিন্তু মাঝপথে শুনলেন মাধুরীলতার মৃত্যু (১৯১৮ সালের ১৬ই মে) হয়েছে। মৃত্যুসংবাদ শুনে মাধুরীলতার শেষমুখটি না দেখেই ফিরে এলেন বাড়িতে। কাউকে বুঝতে দিলেন না কি অসহ্য বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি সন্তানকে হারিয়েছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিটি আঘাত হয়ে উঠতো বেদনাভরা বিষণ্ণতার গান। বড় মেয়েকে তিনি অসম্ভব ভালবাসতেন। মাধুরীলতার মৃত্যুর পর একটি কবিতায় চরম কথাটি বিধৃত করেছেন কবি -

এই কথা সদা শুনি, ''গেছে চলে, গেছে চলে''
তবু রাখি বলে
বোলো না, ''যে নাই''।
সে কথাটি মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়ে বাজে।
মানুষের কাছে -
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে,
তাই তার ভাষা
নহে শুধু আধখানা আশা
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে ''আছে'' ''নাই'' পূর্ণ হয়ে রয়েছে
সমান।

জীবিত অবস্থায় মাধুরীও সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতেন। মাধুরীর মৃত্যুর পর তার কবিতা ও চিঠি-পত্রাদি নিয়ে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয়া কন্যা রেনুকাদেবী রানী (জন্ম ঃ ২৩ জানুয়ারী ১৮৯১ - মৃত্যু ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৩) ঃ মাধুরীলতার বিয়ের ১ মাসের মাথায় ১৯০১ সালের আগস্ট মাসে মাত্র ১০ বছর ৬ মাস বয়সে বিয়ে হয় রেনুকার। রেনুকা এক সন্ন্যাসিনীর মন নিয়ে জন্মেছিল ঐশ্বর্যের মধ্যে! ..... শিশুকাল থেকে সাজগোজ ভালো লাগত না ..... মাছ-মাংস খাওয়ার স্পৃহামাত্র ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল প্রচুর। কবি কিন্তু তাঁর এই মেয়েটিকে খুব ভালবাসতেন। জামাতার নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বোধহয় বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায়ে এই রুগ্না বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ বিয়ের মাত্র ২ দিন পরেই চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। রবীন্দ্রনাথ এই জামাতাকে তিন সহস্র (৩০০০ টাকা) মুদ্রা বরপণ দেন। আমেরিকায় সত্যেন্দ্রনাথকে চিকিৎসাশাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রি অধ্যয়নের জন্য সরকারি তহবিল থেকে প্রতিমাকে নিয়মিত ১০ পাউন্ড পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে একবার পোশাক তৈরির জন্য পাঠানো হলো অতিরিক্ত

৩ পাউন্ড। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ চিকিৎসা-শাস্ত্রে সফল হতে পারলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ফিরে আসবার জাহাজভাড়ার টাকার জন্যও তাঁকে শ্বশুরমশাই-এর কাছেই হাত পাততে হয়েছে। সত্যেন্দ্রর মাকে প্রতিমাসে পাঠাতে হতো পঞ্চাশ টাকা, এবারে জামাতা দেশে ফিরে এলে তাঁর জন্য বরাদ্দ হল মাসিক দেড়শত টাকা। উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ তখনও পর্যন্ত দেড়শত টাকা হিসাবেই মাসোহারা পেতেন। জামাতাকে ডিস্পেনসারির জিনিসপত্র কিনে দেওয়ার জন্যও বেশ বড় পরিমাণ টাকা সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ে সত্যেন্দ্রনাথ তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

বাল্যবিবাহের পর কন্যা ঋতুমতী হলে ঠাকুর পরিবারে ''দ্বিতীয় বিবাহ'' বা ''ফুলশয্যা'' হতো। এবারে রেনুকার ফুলশয্যা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মাঝে মাঝে রেনুকার জ্বর হতো এবং এই ফুলশয্যা অনুষ্ঠানের দিন পনেরো পর থেকেই রেনুকার অসুখের সূত্রপাত। সত্যেন্দ্রনাথও ঘরজামাই ছিলেন। কবিকন্যা রেনুকার ব্যাধি যখন দিন দিন বেড়ে চলছিল ডাক্তাররা বায়ু পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। মীরা, শমী ও অসুস্থ রেনুকাকে নিয়ে হাজারিবাগ রওনা হলেন রবীন্দ্রনাথ। পরে রেনুকাকে নেওয়া হয় আলমোড়ায়। শয্যাশায়ী কন্যাকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টায় পিতা তাঁকে নিত্য নতুন কবিতা লিখে শোনান, ''শিশু'' কাব্যগ্রন্থের জন্ম হয়। আগস্ট মাসের প্রথমে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ আলমোড়ায় এলে রবীন্দ্রনাথের ভার কিছু লঘু অবশ্যই হয়েছিল কিন্তু আলমোড়ার নির্জনবাসে এক নাগাড়ে তিনমাস থেকেও শারীরিক তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না। রেনুকা জোর করাতে সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ রেনুকাকে নিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না, পাহাড় থেকে নামবার সময়ও খুব কষ্ট হয়েছিল। কলকাতায় যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, নার্সও রাখা হয়েছিল। মৃণালিনী দেবী ও মাধুরীলতার মতো তারও যক্ষ্মা হয়। গায়ে রোদ লাগানো ভালো বলে চিকিৎসকদের পরামর্শে রেনুকার জন্য জোড়াসাঁকোর লালবাড়ির তিনতলায় চারদিক কাঁচ দেওয়া একটা ঘর বানানো হলো। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নিঃসন্তান রেনুকা দেবী ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২ বছরের বিবাহিত জীবনের শেষে মাত্র ১২ বছর ৭ মাসে বয়সে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। রেনুকার মৃত্যুকালে সত্যেন্দ্র কোথায় ছিলেন কেউ জানেন না। দীর্ঘকাল তিনি কোনোরকম যোগাযোগ রাখেননি। হঠাৎ করে ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকপদে নিযুক্তি প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ সদ্য মৃতা কন্যার কথা মনে রেখেই সত্যেন্দ্রকে পদে বহাল করতে মনস্থ করলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রবীন্দ্রনাথ বার বার ক্ষমা করেছেন, কিন্তু সবই হয়েছে ভস্মে ঘি ঢালা। মৃনালিনী দেবীর মৃত্যুর নয়মাসের মধ্যে কন্যার মৃত্যু, এটাই কবির জীবনে প্রথম সন্তানশোক।

কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী বা অতসীলতা (জন্মঃ ১২ জানুয়ারী - মৃত্যু ঃ ১৮ জানুয়ারী ১৯৬৯) ঃ ১৯০৭ সালের ৬ই জুন মাত্র ৪ মাস বয়সে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর বিয়ে হয় বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান ভক্ত বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে। উচ্চাভিলাষী নগেন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়ার একান্ত বাসনা, কিন্তু পারিবারিক অবস্থা সে ইচ্ছাপূরণে অনুকূল ছিল না। এ জন্য বিলাত যাওয়ার ব্যয় বহনে ইচ্ছুক এমন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দায়মুক্ত করতেও তিনি রাজি। বিয়ের নামে এই বিনিময় প্রথা রবীন্দ্রনাথের ভীষণ অপছন্দ। কিন্তু প্রিয়দর্শন, তেজস্বী যুবক নগেন্দ্রনাথকে দেখে মত বদল করেন রবীন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠাবার কথা দিয়ে কন্যাদান করলেন। কবির ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন জামাই নগেন্দ্রনাথ বিয়ের তিন সপ্তাহ পর ২৮ জুন ১৯০৭ সালে বিলেত যাত্রা করলেন। তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে। ১৯১০ সালে দেশে ফিরে আসেন। নগেন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কোনো কাজকর্ম্ম নেই, ফলে আয়ও নেই তেমন। নির্লিপ্ত থাকা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সবকিছুতেই গা-ছাড়া একটা ভাব। রবীন্দ্রনাথ কন্যা-জামাতার জন্যে মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয় তার ভাইয়ের পড়াশোনারও দায়িত্ব নিলেন। উপরন্তু বে-হিসাবী জীবনযাত্রাসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে কবির সঙ্গে জামাতার মতান্তর থেকে মনান্তর শুরু হলো। কন্যার প্রতি মমত্ববোধ,আর জামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ কবির দিক থেকে কোনো

ঘাটতি না থাকলেও উভয়ের মানসিকতার যে যোজন পরিমাণ ফারাক সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবিধান কবির সাধ্যাতীত। মীরাদেবীর সাংসারিক জীবন সুখের হয়নি। তিনি পিতার আশ্রয়ে পুত্র কন্যা নিয়ে থাকতেন। কবি তার জন্য আলাদা গৃহ ও মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বার বার চেষ্টা করেছেন স্ত্রীকে নিজের কাছে আনতে কিন্তু মীরা দেবী রাজি হননি। কবি তারা জামাইয়ের স্বভাব চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ''তোমার অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা, তোমার আত্মসম্বরণে অসাধ্যতা, তোমার দুর্দান্ত ক্রোধ এবং আঘাত করিবার হিংস্র ইচ্ছা, সাংসারিক দিক থেকে তোমাকে অনেক সময়ে কঠিন পীড়া দিয়েছে।" (চিঠি ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩২৬)। ১৯২০ সালে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মাধ্যমে তার দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সম্পর্কচ্ছেদের পর বিদেশ থেকে কবি মীরাদেবীকে জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সম্পর্কচ্ছেদের পর বিদেশ থেকে কবি মীরাদেবীকে লিখেছিলেন, ''তোর দুঃখ আমার হৃদয় ভরে আছে। আমি একদিনও ভুলতে পারিনে। এ দুঃখ দূর করি এমন শক্তি আমাদের নেই, তোদের নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হব ঈশ্বর আমাকে সে অবকাশ দেবেন না, সুখের আশা রাখিস নে মীরু, দুঃখকে ভয় করিস নে। তুই যে কোনো শাসনের ভয়ে, পীড়নের দায়ে নিজের সত্তাকে বিকোতে চাস-নে এতে আমি সুখী।" (চিঠি ১৯২১) কন্যাকে নিয়ে কবি কতটা গভীর পীড়া অনুভব করেছেন তা বোঝা যায় পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, ''মীরা যখন খাবার ঘরে ঢুকেছিলো তখন একটা গোখরো সাপ ফস করে ফণা ধরে উঠেছিল। আজ আমার মনে হয়, সে সাপ যদি তখনি তাকে কাটত, তাহলে ও পরিত্রাণ পেত"। (চিঠি, ১৯২১)।

মীরাদেবী ও নগেন্দ্রনাথের নিতীন্দ্রনাথ (নিতু) নামে একটি পুত্রসন্তান ও নন্দিতা (বুড়ি) নামে একটি কন্যাসন্তান ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিতীন্দ্রনাথকে প্রকাশনায় উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য জার্মানীতে পাঠান, এর শিক্ষাব্যয়ও কবিকেই বহন করতে হয়। নিতীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯১২ সালে। নিতেন্দ্রনাথ জার্মানীতে গিয়ে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। কবি জার্মানীতে গিয়েছিলেন নিতেন্দ্রনাথকে শুশ্রূষা করার জন্য। ১৯৩২ সালের ৭ আগস্ট কবির একমাত্র দৌহিত্র মাত্র ২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। কবির ''দুর্ভাগিনী" কবিতাটি পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, এটি কবি লিখেছিলেন তাঁর ছোট মেয়ের কথা মনে করে। মীরাদেবীর কন্যা নন্দিতা ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক কৃষ্ণ ক্রিপালারি সাথে তার বিয়ে হয়। এই দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। ৫১ বছর বয়সে ১৯৬৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মেয়ের মৃত্যুর পর মীরাদেবী ৭৫ বছর বয়সে ১৯৬৯ সালে শান্তিনিকেতনে মৃত্যুবরণ করেন।

ভাবতেও অবাক লাগে যে রবীন্দ্রনাথের মত একজন পথপ্রদর্শক মানুষও তৎকালীন সমাজের চাপে তাঁর কন্যাদের হারাতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন পিরালি ব্রাহ্মণ, পুত্র বা কন্যার বিবাহে সমাজে অন্যদের কাছে তাঁরা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতেন। অন্যদের জীবনের ধ্রুবতারা, রবীন্দ্রনাথ, নিজের কন্যাদের যথাযোগ্য শিক্ষিত না করে বিবাহে অপরিণত বয়সে অর্থলোভী পুরুষদের হাতে তুলে দেন। ফলে তাঁদের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। অকালমৃত্যু বা বিচ্ছেদ হয়ে ওঠে তাঁদের ভবিতব্য। নারী প্রগতিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যে সঙ্গে তাঁর কন্যাদের লালনপালনের কোন মিল নেই। কবি কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা থেকেই সাহিত্যের সফলতা পেতে চাইলেন? - প্রশ্ন রয়ে গেল।

Little Buffy and Her Birthday Gift

Santanu Banerjee
Professor

Buffy, the little butterfly opened her eyes to the bright sun of a new dawn. Buffy rubbed her eyes and stretched out her legs and spread out her colourful wings to feel the morning breeze. She hopped out off her bed on the branch.She leapt onto the green, dew soaked leaves.

She chased to her Mom's shell nearby.

"Good morning, my baby", Mom greetedher.

Buffy yelled, "Do you remember what today is?"

"No, what is today?"Mom teased her a little.

"It is my Birthday", exclaimed Buffy with conceit, "I'm five months old today."

"Oh," mom said, "Is it your birthday Today?"

"Mom, you forget! Don't you?" murmured Buffy.

"Can a Mom ever forget her Kids' birthday? It's the most favorite day of my life." Mom smiled and pulled out a tiny box fastened with a bright red ribbon. "It's for you."

Buffy promptly pulled apart the wrapping paper and yanked off the ribbon. She opened the box and it was…… a cute little mouth organ!

Buffy was so happy. She immediately picked it up and eagerly started playing.

Only to her surprise, it did not sound too melodious. Buffy got disappointed and threw down the mouth organ.

Mom picked it up and returned her saying, "Buffy, don't give up. Try again. You'll hardly know how wellis it if you give up so quickly."

Buffy wanted the mouth organ passionately, but did not want to take the time to learn how to play it.

That night, Buffy tried again. The day after,she tried again. In the following evening, she tried again. Each time she tried a little longer and a little harder. One day Buffy could play the most beautiful lyric on her mouth organ.

Buffy and her Mom would sit for hours together while Buffy played the song over and over until it became perfect! Buffy was so proud of herself and her Mom was so proud of her Buffy too! Because, she did not give up hope.

সুন্দরবন হারিয়ে যাচ্ছে!!

রাজু সরদার
ছাত্র

গবেষকদের মতে ২০১৭ সালের মধ্যে সমস্ত সুন্দরবন বঙ্গোপসাগরের জলে ডুব যাবে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহর থেকে খবরটা দিয়েছে সংস্থা পিটিআই।

কারণ বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের ফলে সমুদ্র জলের বৃদ্ধি। গত শতাব্দীর প্রথম নয়টি দশকে সমস্ত পৃথিবীতে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ১.৮ মিলিমিটার। ১৯৯৩ আর ২০০৩ সালের মধ্যে এটা দাঁড়ায় বছরে ৩.১ মিলিমিটার। তারপর থেকে হয়ে গিয়েছে বছরে ৫ মিলিমিটার।

ভারত ও বাংলাদেশের পাশাপাশি অঞ্চলের ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গরান গাছের এই বিরাট জঙ্গল তার একাংশ হারিয়েছে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এই শতাব্দীর শুরু থেকে ডোবার হার বেড়ে গিয়েছে। ভারতের হাজার ১৯৯৬ সালে লোহাচুড়া দ্বীপ ডুবে গিয়েছে। ঘোড়ামারা দ্বীপের অর্ধেকটা ডুবে গিয়েছে একই বছরে।

এদেশের যে ১০০ টি প্রায় বিপন্ন দ্বীপ। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ডালহৌসি, মৌসুমী, ভাঙা দুয়ারী, জম্বু দ্বীপ, সাগরদ্বীপ ইত্যাদি। বাংলাদেশের ভোলা দ্বীপ তার অর্ধেকটা হারিয়েছে বেড়ে ওঠা জলে ডোবার আর মেঘনা নদীর জলের চাপে ভাঙ্গনের ফলে।

বলা বাহুল্য, সুন্দরবন ডুবে যাওয়ার ফল ভয়াবহ হবে। যেসব জায়গা জলের তলায় চলে গিয়েছে, সে সব থেকে হাজার হাজার লোক বাড়ি জায়গা জমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছে। যেস জায়গায় ডোবেনি, সেগুলোতেও সমুদ্রে জলের অনুপ্রবেশ জমিকে লবণাক্ত আর ফসলের অযোগ্য করে তুলেছে।

সুন্দরবন এমনকি, তার অধিকাংশ ডুবে গেলে তার পরিণতি কেবলমাত্র বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। গঙ্গা, পদ্মা এবং মেঘনার পুরো ব-দ্বীপ অঞ্চল উপলব্ধি হবে। সুন্দরবনের গরান গাছের জঙ্গল সামুদ্রিক প্লাবনের পথ আটকায়। সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ কম করে। এটা ডুবে গেলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের বন্যার প্রকোপ প্রলয়সম হয়ে উঠবে।

কেবলমাত্র মানুষ ভুক্তভোগী হবেনা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সুন্দরবনের দক্ষিণ রায়ের প্রজা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ভারতের দিকে এদের সংখ্যা ১০৩। ২২ টি দক্ষিণ ২৪পরগণা আর ১৮০টি সুন্দরবনের বাঘেদের জন্য সংরক্ষিত জঙ্গল। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পরিচালিত একটি পরিগণনা অনুসারে, বাংলাদেশের বাঘের সংখ্যা ১০৬। যেখানে ২০০৪ বাঘের সংখ্যা ছিল ৪৪০।

অন্যদিকে ভারতের ২০০৬ সালে বাঘের সংখ্যা ছিল ১৪১১। ২০১০ সালে বাঘ সংখ্যা বেড়ে হলো ১৭০৬। ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ২২২৬। ২০১৮ সালে থেকে যে পরিগণনা আরম্ভ হয়েছে তাতে সংখ্যা বেশ কিছু বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা বলেন। কিন্তু অন্য জায়গায় বাঘের সংখ্যা যতই বাড়ুক সুন্দরবনের বাঘের অস্তিত্ব হলে সেটা প্রচন্ড দুঃখের ব্যাপার হবে। এটা লুপ্ত হয়ে গেলে বাঘ ছাড়া নানা ধরনের সাপ, পাখি ও জলজ প্রাণী আবাসস্থল হারাবে।

নেদারল্যান্ডে বাঁধ তৈরি করে সমুদ্রের জল সেচ করে জমি তৈরি করা হয়েছে। ভারতের মুম্বাইয়ের ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন এলাকার সৃষ্টি মোটামুটি একইভাবে হয়েছে। বাঁধবে কে সুন্দরবনের একটা বড় অংশকে বাঁচানো যেতে পারে। এখন থেকেই সেই চেষ্টার শুরু হওয়া দরকার। একই সঙ্গে আরম্ভ করতে হবে যেসব এলাকাকে বাঁচানো যাবে না, সেখানকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। সুন্দরবনকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম কর্তব্য।